মুক্তিযুদ্ধের
পূর্ব প্রস্তুতি ও
স্মৃতি '৭১
বুলবুল মহলানবীশ

প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী ও কবি বুলবুল মহলানবীশের জন্ম ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ। সমাজ সচেতন সংস্কৃতিবান পরিবারের সদস্য হিসেবে ছোটবেলা থেকেই লড়াই করেছেন সব রকম অসংগতির বিরুদ্ধে। বাবা-মায়ের উৎসাহেই আবৃত্তি ও সংগীত চর্চার পাশাপাশি ছড়া কবিতা গল্প লেখার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আবার পারিবারিক সূত্রেই পেয়েছেন নিজেকে প্রকাশ না করার অভ্যাস। সম্প্রতি শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ ও অনুপ্রেরণায় প্রকাশ করছেন নিজেকে।

১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাশ করার পর প্রকৌশলী স্বামী মুক্তিযুদ্ধের সাব সেক্টর কমান্ডার সরিত কুমার লালার সঙ্গে আবুধাবি গমন করেন এবং সেখানে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন।

'৮৭-তে ঢাকায় ফেরত আসেন এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৬ বছরের দীর্ঘ বিরতির পর ৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন এবং পুনরায় মধ্যপ্রাচ্যের আবুধাবি গমন করেন এবং শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন।

শৈশব এবং কৈশোরে আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হননি কখনো। জেলা সংগীত প্রতিযোগিতায় পেয়েছেন স্বর্ণপদক। ১৯৯০ সালে বারীণ মজুমদার পরিচালিত 'মনিহার সংগীত একাডেমী' থেকে ডিস্টিংশনসহ প্রথম হয়ে বিশ্ববরেণ্য বেহালা-শিল্পী পণ্ডিত ভি.জি. যোগের হাত থেকে নিয়েছেন সনদপত্র এবং পেয়েছেন 'সংগীত মণি' উপাধি।

'৬৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরই নিয়মিত তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসেবে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র এবং টেলিভিশন থেকে নিয়মিত সংগীত এবং নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক 'জল্লাদের দরবার'-এ মূল নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং সংগীতে অংশগ্রহণ করেছেন। একই সময়ে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে আমন্ত্রিত হয়ে পরিবেশন করেছেন নজরুল সংগীত।

বর্তমানে মাসিক 'অরিত্র'র নির্বাহী সম্পাদক।

প্রকাশিত গ্রন্থ : পারস্য উপসাগরের তীরে (ভ্রমণ কাহিনী), সংহিত সংলাপ (কবিতা গ্রন্থ), নীল সবুজের ছড়া (ছড়ার বই)।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি ও স্মৃতি '৭১
বুলবুল মহলানবীশ

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৬

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১৭৫ ৪২৮২১০, ০১৭২ ২৩৫৩৪২, ০১৯২ ১৭০৬২৫
e-mail: ittadisutrapat@yahoo.com

বর্ণবিন্যাস
মানিক

প্রচ্ছদ
সুমন রহমান

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১০০ টাকা

ISBN 984 851 809 9

উৎসর্গ

মুক্তিযোদ্ধা লেঃ সরিতকুমার লালা

ও

সকল মুক্তিযোদ্ধার উদ্দেশে

ভূমিকা

বিশ্বখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ, গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী, যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত আপনজন সেই প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের বংশধর বুলবুল মহলানবীশ একাধারে কবি, সঙ্গীতশিল্পী এবং মুক্তিযোদ্ধা।

তার বাবা অরুণচন্দ্র মহলানবীশ ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি। ব্রিটিশ আর্মিতে চাকুরী করেও তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তার মাও ছিলেন একজন রুচিবান, প্রগতিশীল মহিলা। সমাজ সচেতন সংস্কৃতিবান পরিবারের সদস্য হিসেবে ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে একটি প্রতিবাদী সত্তা গড়ে ওঠে। বাবা-মায়ের উৎসাহে আবৃত্তি ও সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি সে রাজনীতিমনস্ক হয়ে ওঠে। মাত্র বারো বছর বয়সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক দল নিয়ে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান করা শুরু করে। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হয়। মাধ্যমিক পাশ করার পর তার বিয়ে হয় চট্টগ্রামের আরেক বনেদী পরিবারের সরিতকুমার লালার সঙ্গে।

বুলবুল আমার একজন প্রিয়পাত্রী। মাঝে মাঝে তার দুরন্ত সাহস দেখে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি। আমি তার উপর 'আলোর লড়াই চালিয়ে যাও' শিরোনামে একটি কবিতাও লিখেছি।

সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে সে একটি গ্রন্থ রচনা করেছে। গ্রন্থটির মধ্যে ফুটে উঠেছে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধের বহু বিচিত্র বর্ণাঢ্য ঘটনা।

স্মৃতি ইতিহাস। স্মৃতি ইতিহাস পরখ করে দেখার দর্পণ। তাঁর স্মৃতির আর্কাইভে বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই, জাগরণ চেতনার উৎসারণ, সব থরে থরে সাজানো। এ-গ্রন্থ কি কেবলই স্মৃতিসংকলন কিংবা স্মৃতিরোমন্থন! না, এর চেয়ে বেশি। পরিবারের দীর্ঘপথ চলার মধ্য দিয়ে সে মূলত যুদ্ধের ফ্রন্ট খুঁজছিল। স্মৃতিবিলুপ্তির এ-প্রদোষকালে এ-গ্রন্থ ঐতিহাসিক চেতনা বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে। মুক্তিযুদ্ধকে পরিচয় করিয়ে দেবে নব প্রজন্মের কাছে। চলতে

চলতে সে পুরনো চেনা মানুষকে নতুন করে জানছে আর চেনা-অচেনা মানুষের গণ্ডি আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। যুদ্ধের মধ্যে মানুষকে আবিষ্কার করছে- মানুষের সম্পর্কের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করছে। এই গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক অভিযাত্রার ধারাভাষ্য। তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি অন্যের দৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গি।

আমাদের ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে, দ্যাখো ১৯৭১ অতীত নয়, পথপরিক্রমার, ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ফোটোজেনিক মেমোরি আর ফোটোগ্রাফিক চোখে কী উঠে আসেনি এ গ্রন্থে– মানুষ, মানুষের ভেতর-বাহির, মতাদর্শের বড়াই করে যারা মানবিকতা বলি দেয় তাদের কথা– চিন্তার পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষের সংগ্রামের মৌলিক প্রণোদনার প্রতি সজল আবেগ–সত্যভাষণে একাগ্রতায়, উঠে এসেছে।

করবী ফুলের গোটা বিষ .... । শত্রুর হাতে ধরা পড়লে করবী গোটায় আত্মহনন। অন্তরে-বাইরে সশস্ত্রতার এক উপাখ্যান। লড়াই হবে চেতনার, মুখোমুখি এবং ফ্রন্টে ফ্রন্টে। একটি পরিবার, একজন বুলবুল মহলানবীশ ছুটে চলেছে... ১৯৭১ ... ফ্রন্ট অভিমুখী এ-যাত্রা।

১৯৭১ আত্মোৎসর্গের এক অসামান্য কালপর্ব। দুরন্ত কৈশোর কেটেছে মিছিলে, সমাবেশে। ১৯৭১-এর প্রস্তুতির প্রতিটি ক্ষণ, কিশোরী বুলবুল মহলানবীশের চঞ্চলতা, বাবার কাছে ইতিহাসের আর আদর্শের যে হাতেখড়ি, নারিন্দা-দয়াগঞ্জ থেকে মহিলা মিছিলের পুরোভাগে থেকে তার যে দৃপ্ত উচ্চারণ– পাড়ায়, পরিবারে আর ঢাকা শহরের প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততার অনবদ্য বর্ণনায় এ গ্রন্থ হয়ে উঠেছে ইতিহাস, স্মৃতিসংকলন, আমাদের জাগরণের ও অস্তিত্ব বিনির্মাণের শক্তি সমাবেশের চয়ন, মানুষের মানবিকতার উৎসারণের এক অনবদ্য দলিল। যুদ্ধের ভেতর কী দেখা যায়? হত্যা, রক্তপাত, দগ্ধ গ্রাম– দুশমনের কপটতা– বুলবুল ১৯৭১-এ মানুষের হৃদয় দেখেছে।

তাঁর এ-গ্রন্থে অতীত এসেছে বর্তমানের কাঁধে চড়ে, আর ভবিষ্যতে পৌঁছুবার তাগিদ থেকে। এ কোনো আত্মকথন নয়, নিজের ভূমিকা নিয়ে প্রগল্‌ভ পল্লবগ্রাহিতা নয়, মতাদর্শিক আড়ষ্টতায় কাবু দুর্বল শব্দ নয়–এ হচ্ছে বর্তমানের স্মৃতিশূন্যতার প্রতি কড়া লিখিত জবাব।

এক কিশোরীর যুদ্ধে যুদ্ধে নারী হয়ে উঠবার, শক্তি সাহস আর চেতনায় নিজেকে আবিষ্কার করার কাহিনী। স্মৃতি আর ইতিহাস একাকার–অন্তর্লীন। বুলবুল মহলানবীশ সব দেখছে– প্রকৃতি, প্রণয়, বেদনা, রোদন, রক্তপাত,

শ্যামল গ্রাম। এ-গ্রন্থ যেন ১৯৭১ সালের বাংলার প্রকৃতি, মানুষ ও সংগ্রামের এক অনবদ্য দলিল। যারা বাংলাদেশের সামষ্টিক স্মৃতি থেকে মুক্তিযুদ্ধ মুছে ফেলতে পারলেই বেঁচে যায়, তাদের জন্য এই গ্রন্থ এক কড়া হুঁশিয়ারি।

বুলবুল মহলানবীশ মুক্তিযোদ্ধা, শব্দসৈনিক। তার স্বামী সরিতকুমার লালা ৫নং সেক্টরে সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তার গোটা পরিবার নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। বুলবুল এ-গ্রন্থে স্মৃতিচারণ করেছেন এমন সব ঘটনার যা লক্ষ স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে। এ-গ্রন্থে তার স্মৃতি, তার কথা, নানা পরিচ্ছেদে বর্ণিত ছোট ছোট কথা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের খণ্ডচিত্র।

এ-গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসের এক স্মৃতি-দলিল। বর্তমানের মধ্যে অতীত, অতীতের বুক থেকে হা-হুতাশ নয়, ধূসর স্মৃতি নয়– একেবারে সেইসব জ্বলন্ত ঐতিহাসিক উপাদান যা দেবে এক নতুন যুদ্ধের পাঠ। ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১- ইতিহাসের নায়ক আর খলনায়ক সবাই উঠে এসেছে এই প্রামাণ্য স্মৃতি দলিল কথায়।

তার ভাষা প্রাণবন্ত, গতিময়, সরল সাবলীল। কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। লেখার সাবলীলতা পাঠককে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। মনে হয়, এক নিশ্বাসে সমস্তটাই যদি পড়ে ফেলতে পারতাম!

তার এই স্মৃতিকথা ভাষায়, বিষয়ে এবং ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে কালাতীত সাহিত্যকর্মে পরিণত হয়েছে। পরিণত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের একটি সুলিখিত ঐতিহাসিক দলিল-এ।

আমি আশা করি, এই গ্রন্থ পাঠক সমাজের চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দেবে।

(মাহবুব উল আলম চৌধুরী)

তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
বাড়ি-৪৮, রোড-২০, সেক্টর-৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, ফোন: ৮৯১২১৪২

এই শ্যামল প্রান্তর আমার সজীবতার উৎস;

এই রক্তরাঙা সূর্য আমার প্রাণের স্পন্দন

এই দেশ এই মাটি আমার অহঙ্কার

এই পতাকা আমার পরিচয়

'স্বাধীনতা' আমার অস্তিত্ব আমার শক্তি।

আজকের এই মাৎসান্যায়ের কালে, অনেক হাহাকার, অনেক আহাজারির মধ্যেও আমার জাতীয় পতাকা, আমার জাতীয় সংগীত আমাকে বলতে শেখায়ঃ

'এ দেশ আমার গর্ব

এ মাটি আমার কাছে সোনা।'

কিন্তু রাজা যায়, রাজা আসে। নতুন নতুন কাহিনী লেখা হয়। মুছে ফেলা হয় পুরোনো কাহিনী। দৃশ্যপট যায় বদলে। সাধারণ খেটে-খাওয়া সরল মানুষগুলোর জীবন বদলায় না। চাল, তেল, নুন, সবজি'র মূল্য বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাস। গডফাদার, গডমাদারদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের শান-শওকতও বাড়ে, কমে শুধু মানুষের জীবনের মূল্য ও মূল্যবোধ।

গত পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে যারা বাংলাদেশকে দেখে বড় হয়েছে, তারা ধারণাও করতে পারে না যে, কত সংগ্রাম কত আন্দোলন, কত রক্ত আর কত আত্মবলিদানের ফসল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং সচেতন মানুষের আশা-

আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, পাওয়া না-পাওয়াকে ঘিরে যে জীবনচিত্র তা স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে। তারা জানে না কেন ভাষা আন্দোলন, কেন একুশে ফেব্রুয়ারি, কেন ছয় দফা, কেন এগারো দফা, কেন উনসত্তরের ছাত্র আন্দোলন এবং সেই পথ ধরে গণঅভ্যুত্থান, কেন সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, কেন বঙ্গবন্ধু-ভাসানী-মোজাফ্‌ফর-মণি সিংহ'র সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ভেঙে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার ডাক, কেন পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রী শাসকগোষ্ঠীর দমননীতির বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার আহ্বান। তারা জানে না কেন ছায়ানট, কেন উদীচী, কেন ক্রান্তি, কেন কচিকাঁচার মেলা, কেন খেলাঘর, কেন ইত্তেফাক, কেন সংবাদ! এমন অনেক কেন'র উত্তর তাদের জানা নেই। জানার আগ্রহও নেই। তারা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন, রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ, বেগম রোকেয়া-প্রীতিলতা-ইলা মিত্র, বেগম সুফিয়া কামাল-জাহানারা ইমাম, ডঃ শহীদুলাহ্-জি সি দেব-মুনীর চৌধুরী, এমন অনেককেই চেনে না, জানে না, নামও শোনেনি। তারা একতারা-দোতারা, ঢোল-মৃদঙ্গ, মন্দিরা-করতাল, কাঁসর-ঘণ্টা তো দূরের কথা হারমোনিয়ম তবলা দেখেও ভ্রূ কুঁচকায়! সংস্কৃতিক্ষেত্রে দূষণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে অধিকাংশ শ্রোতা-দর্শকই সংগীত এবং চিৎকার, লম্ফ এবং নৃত্যের পার্থক্য বোঝে না। লোকসংগীতের নামে অশ্লীল শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির জয়জয়কার। গণসংগীতের নামে অসুরে-বেসুরে মিলে যে ধস্তাধস্তি ও কুস্তি-কসরত শুরু হয়েছে তাতে শুদ্ধ সংগীতের শ্রোতা ও শিল্পীদের হৃদয় ও মস্তিস্কে হচ্ছে রক্তক্ষরণ! অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না!

একুশে ফেব্রুয়ারি এলে এখনো আমি প্রচণ্ড আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। একুশের গান শুনলে আমার বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে গভীর ক্রন্দন, মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে উচ্চারিত হয় শপথবাক্য– 'ও আমার গানের ভাষা/ও আমার প্রাণের ভাষা/ও আমার মনের ভাষা নিয়ে/ যারা ছিনিমিনি খেলবে/মোদের এই হাতের মুঠো তাদের পিষে দলবে'। যেমন হতো আজ থেকে সাঁয়ত্রিশ-আটত্রিশ বছর আগে। যখন পাড়ায় পাড়ায় আমার গানের দল নিয়ে ঘুরে ঘুরে গাইতাম 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি', 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' কিংবা 'ওরা নাকি আমাদের ক্ষেত আর খামারের সবুজের স্বপ্ন কেড়ে নিতে চায়' অথবা 'ইতিহাস জানো তুমি আমরা পরাজিত হইনি' ইত্যাদি গান। কতইবা ছিল আমাদের বয়স! বারো থেকে পনেরোর মধ্যে! দয়াগঞ্জ-নারিন্দা,

ওয়ারি, লক্ষ্মীবাজার, তাঁতিবাজার, গেণ্ডারিয়া, ফরাশগঞ্জ, বাংলাবাজার, শাঁখারিবাজার– এদিকে স্বামীবাগ, গোপীবাগ টিকাটুলি। এই পর্যন্ত ছিল আমাদের সীমানা।

তখন পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল করে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান হতো। এই দিনটিকে ঘিরে বাঙালির আবেগ এবং প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কাছে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঘেঁষতে সাহস পেতো না। যখন গাইতাম 'মাগো তোমার সোনার মানিক ছুটি হলেও ফিরবে না' কিংবা 'আমি তোমারই জন্য জীবন দিয়েছিলাম' তখন কত মাকে দেখেছি ফুঁপিয়ে কাঁদতে– চোখ মুছতে। আমারও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। গানের শেষের দিকে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত।

সেই সময় পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের সচেতন মানুষেরা বাঙালীর ভাষা, ঐতিহ্য, কৃষ্ঠি ও অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তা আপাতভাবে হয়তো দৃষ্টিগোচর হয়নি কিন্তু এই দীর্ঘ প্রস্তুতির জন্যই উনসত্তরের ছাত্র আন্দোলন যথার্থ অর্থেই পরিণত হয়েছিল গণঅভ্যুত্থানে-যেখানে বিভিন্ন পেশার সর্বস্তরের মানুষ শামিল হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে, যার সফল পরিণতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা।

জগন্নাথ কলেজ ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান। আমি যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী তখন থেকেই নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করতাম এইসব কর্মকাণ্ডে। প্রতিবছর হতো বসন্তউৎসব আর একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান। গণসংগীত শিল্পী সুখেন্দু চক্রবর্তী, শেখ লুৎফর রহমান, আবদুল লতিফ, জাহেদুর রহিম, অজিত রায় এমনি নামি-দামি শিল্পীদের সঙ্গে ফ্লোরা (রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পী ফ্লোরা আহমেদ), মুন্নি (বর্তমানে পাকিস্তানের প্রখ্যাত গজল শিল্পী মুন্নি বেগম), কাদেরী কিবরিয়া লতা এবং আমার মতো খুদে শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করত। অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান, অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, আবদুল মতিন স্যার, অপেক্ষাকৃত তরুণ শিক্ষক রাহাত খান এবং জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন ছাত্র সংসদের অত্যন্ত জনপ্রিয় ভিপি, বর্তমানে সংসদ সদস্য রাজিউদ্দীন আহমেদ প্রমুখের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অংশগ্রহণের ফলে অনুষ্ঠানগুলো হয়ে উঠত সর্বাঙ্গসুন্দর।

রাহাত খানের লেখা এবং সুখেন্দু চক্রবর্তীর সুরে একুশের যে-গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়েছিল জগন্নাথ কলেজের মঞ্চে তার বারো চোদ্দটি গানের মধ্যে

ছয় সাতটি গান এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে দেশব্যাপী একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতিটি অনুষ্ঠানে কেউ-না-কেউ এর তিন চারটি গান পরিবেশন করত একক অথবা দলীয়ভাবে। আমার গাওয়া 'মাগো তোমার সোনার মানিক ছুটি হলেও ফিরবে না' আর 'এই ঢাকার শহরে' গান দুটি এবং কাদেরী কিবরিয়ার সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া 'আমি তোমারই জন্য জীবন দিয়েছিলাম' গানটি সেই সময় খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

সওগাত সম্পাদক নাসিরুদ্দিন সাহেবের বাসাকে কেন্দ্র করে এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নারিন্দা-দয়াগঞ্জ এলাকায় গড়ে উঠেছিল বাঙালি ঐতিহ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ। অভিযাত্রিক ক্লাব ছিল এর চালিকা শক্তি। তারুণ্যের শক্তিকে সঠিক পথপ্রদর্শন ও দিকনির্দেশনা দেয়াই ছিল এই ক্লাবের প্রধান লক্ষ্য। একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল এই অভিযাত্রিক ক্লাবের।

নারিন্দার বিশিষ্ঠ উকিল আফসারউদদীন আহমেদ, আজাদ পত্রিকার ম্যানেজার হাকিম সাহেব, রোকোনুজ্জামান খান দাদাভাই, ধীরেন ভৌমিক, নুরুদ্দিন আহমেদ, মহিউদ্দিন আহমেদ, আমার বাবা অরুণচন্দ্র মহলাবনীশ, কাকু নির্মলকান্তি দাশগুপ্ত, সাংবাদিক তোহা খান, মণ্টু খান এমনি আরো অনেকে এই অভিযাত্রিক ক্লাব এবং নারিন্দা-দয়াগঞ্জ এলাকার শিক্ষা স্বাস্থ্য ঐতিহ্য কৃষ্টি সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁদের শ্রম-মেধা-অর্থ-সময় সব কিছু ব্যয় করেছেন অকাতরে। বাবা লিখেছিলেন অভিযাত্রিক কাবের 'থিম সং':

এসো এই পতাকা তলে
আমরা সবাই মিলে
শপথ লইব দেশকে জাগাবো
ভেদাভেদ যাব ভুলে।
শান্তির গান আমরা গাহিব
অভিযাত্রী দল
দেশের স্বার্থ, মোদের স্বার্থ
দেশের বলই বল।

এরকম একটি আবহ এবং পরিবেশেই কেটেছে আমার শৈশব। বাংলা ভাষা, গান, কবিতা, নাটক এবং বাঙালির নানা উৎসবকে চেতনায় তীব্রভাবে ধারণ করেই কৈশোরে উপস্থিত হয়েছি। একদিকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বদানকারী আমার বাবার ধ্রুপদী এবং লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক ধ্যান-

ধারণা এবং তার সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী, সকল রকম শুভ কাজে আমার মায়ের উৎসাহ, অন্যদিকে আমার সংগীতের শিক্ষাগুরু শেখ লুৎফর রহমান ও সুখেন্দু চক্রবর্তী'র (সকলের খোকা দা, আমার কাকু) গণসংগীতের প্রতিবাদী ধারা এবং সেইসাথে যুক্ত হয়েছে আমার শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষক নিতাই রায়ের কাছে প্রাপ্ত ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের নির্মোহ দর্শন। সব মিলে আমার সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে একটা মিশ্র বোধ যা বাঙালি ঘরানার হয়েও বিশ্বজনীন। উপলব্ধিতে চিন্তায় পরিকল্পনায় পরিবেশনায় তখন একদিকে বাংলা ভাষা, বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অন্যদিকে শুদ্ধ সংগীত ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি বিশ্বমানবতার চিন্তা-চেতনার প্রতি তীব্র আকর্ষণ। একুশে ফেব্রুয়ারি , বাংলা নববর্ষ, বসন্তউৎসব, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালন করা তখন আমাদের নেশায় পরিণত হয়েছিল। আমি আমার ছোট্ট দল নিয়ে ভৈরবে পর্যন্ত অনুষ্ঠান করতে গিয়েছি এবং এখন ভাবতে বিস্ময় জাগে, আমাদের অভিভাবকেরা তাতে বাধা দেননি। দক্ষিণ মৈশন্ডি স্কুলের প্রধানশিক্ষক, নামটা ভুলে গেছি, সম্ভবত শৈলেশ গুহ-এই যাত্রায় তিনিই ছিলেন আমাদের অভিভাবক। আমাদের সঙ্গে আরো ছিলেন আমার বড়ভাই ও সহেলি আচার্যের বড় বোন মঞ্জুদি ও তাঁর স্বামী যশোদা আচার্য। আমরা পাঁচজন ফ্রকপরা গণসংগীতের শিল্পী- আমি, সহেলি, ঝিনু, নোটন আর নীলু। পুরুষবর্জিত এই গণসংগীত শিল্পীরা কিন্তু যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছি এবং সেইসাথে পেরেছি গণমানুষের চেতনায় টোকা দিতে।

সপ্তম অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই বাঙালির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চক্রান্তের বিষয়টা বুঝতে পারছিলাম ধীরে ধীরে।

বছর দুই আগেই আমরা ফিরেছি পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি থেকে। সেখানে আমরা ছিলাম তিন বছর। সেখানকার র‍্যাশনের চাল ছিল সরু এবং পরিষ্কার। তা ছাড়া ময়দা, আটা, ঘি, চিনি, সেমাই সবই দেয়া হতো ন্যায্য মূল্যে। কিন্তু ঢাকায় আসার পর দেখলাম র‍্যাশনের চাল এত মোটা এবং খারাপ যে তা আমরা খেতে পারতাম না। কাজেই বাইরের দোকান থেকে বেশি দাম দিয়ে চাল কিনতে হতো। বাবা-মার কথাবার্তা এবং ক্ষোভ-অভিযোগ থেকেই বিষয়টা বুঝতে পারতাম।

একটি অনুষ্ঠানে আমাকে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে বারণ করা হয়েছিল এবং নজরুলের 'ভোর হল দোর খোল' গানের শেষ লাইন 'জয়গানে ভগবানে'র স্থলে 'জয়গানে রহমানে' গাইতে বলা হয়েছিল। আমার বাবা সেই আসরে আমাকে গান গাইতে দেননি। আমি গান না গেয়েই বাসায় চলে এসেছিলাম। আমি ছোট হলেও বুঝতে পেরেছিলাম কেন বাবা আমাকে সেখানে গান গাইতে দেননি। এভাবেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করাও শিখেছিলাম আমার অত্যন্ত সাহসী এবং আদর্শপরায়ণ বাবার কাছেই।

উনসত্তর সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার আগেই যুক্ত হয়েছিলাম ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে। পাশ করার পর ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করলাম এগারো দফাভিত্তিক ছাত্র আন্দোলনে । আমার বড় ভাই তরুণকুমার

মহলানবীশ তখন বি,এস-সি.-র ছাত্র এবং ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য। মিটিং, মিছিল, স্লোগান, লাঠির বাড়ি, টিয়ার গ্যাস, প্রচণ্ড চোখের যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফেরা কিংবা কারফিউ হয়ে গেলে ছাত্রাবাস বা কোনো বাড়ির সিঁড়ির নিচে আত্মগোপন করে রাত কাটানো ছিল প্রায় নিত্য-নৈমত্তিক ঘটনা। আমরা ছিলাম মতিয়া গ্রুপের সদস্য। অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীর কোনো মিটিং তখন বাদ দিতাম না। তাঁর জ্বালাময়ী এবং তথ্যভিত্তিক বক্তব্য প্রতিটি দর্শকশ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। এ ছাড়া তখন শেখ লুৎফর রহমান, সুখেন্দু চক্রবর্তী'র নেতৃত্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গণসংগীত পরিবেশন করেছি এখানে ওখানে। শহীদ সাবেরের লেখা লুৎফর রহমানের সুরে 'ওরে মাঝি দে নৌকা ছেড়ে দে' এবং রাহাত খানের লেখা সুখেন্দু চক্রবর্তীর সুরে 'ওরা নাকি আমাদের খেত আর খামারের সবুজের স্বপ্ন কেড়ে নিতে চায়' গান দুটি আমি অনেক অনুষ্ঠানেই গেয়েছি। আবদুল লতিফ, জাহেদুর রহিম, অজিত রায়, মাহমুদুর রহমান বেনু, কাদেরী কিবরিয়া, ফকির আলমগীর এবং আরো অনেক শিল্পীই সেসব অনুষ্ঠানে সমবেত ও একক সংগীত নিয়ে অংশগ্রহণ করতেন।

সত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমার নেতৃত্বে নারিন্দা-দয়াগঞ্জ এলাকা থেকে বের হল এক বিশাল মহিলা-মিছিল। কী বিশাল লম্বা সে মিছিল! ওয়ারি থেকে দয়াগঞ্জ বাজার পর্যন্ত আধা মাইলেরও বেশি লম্বা সে-মিছিল। উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং তারুণ্যে আমরা তখন টগবগ করছি।

তারপর সত্তরের নির্বাচন এবং সেই ঐতিহাসিক ফলাফল। ভোট দিতে পারিনি কারণ তখনো বয়স হয়নি। ভোটকেন্দ্রে গিয়েছি, দেখেছি লম্বা লাইনে ভোটারদের দাঁড়িয়ে থাকতে কিন্তু আমি নিজে অংশগ্রহণ করতে পারছি না। সে যে কী কষ্ট আর হতাশা! দুঃখের চোটে কেঁদেছিলাম সারারাত।

ভোট দেয়ার বয়স না হলে কী হবে, সত্তরের অগাস্টে আমার বিয়ে হল প্রকৌশলী সরিতকুমার লালার সঙ্গে। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষের ছাত্রী। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যই আমি বেশির ভাগ সময় থাকতাম ঢাকায় আমার বাবার বাড়িতে। আর আমার স্বামী তার কর্মক্ষেত্র ফরিদপুরে এবং আরো পরে সিরাজগঞ্জে থাকত ।

এদিকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘটছে মুহুর্মুহু পরিবর্তন। এই সময়ের ইতিহাস সকলেরই জানা। ৩রা মার্চে নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হল ১লা মার্চ তারিখে। সঙ্গে সঙ্গে নামল ছাত্র-জনতার ঢল। প্রতিবাদে প্রতিরোধে ঢাকা শহর তখন উত্তাল জনসমুদ্র।

২রা মার্চ নারিন্দা-দয়াগঞ্জ এলাকায় সাংবাদিক আবেদ খানকে আহ্বায়ক এবং মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের প্রতিমন্ত্রী)-কে যুগ্ম আহ্বায়ক করে গঠিত হল সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। আমাদের নারিন্দার বাসা হল একটা ছোটখাটো ট্রেনিং ক্যাম্প। বাবা ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন। তাই হঠাৎ আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল, লাঠি বা বাঁশ দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা, ক্রলিং, ফার্স্ট এইড ট্রেনিং ইত্যাদি তিনিই শেখাতে লাগলেন। বাঁশ কেটে ছুঁচোলো করে বানানো হল বল্লমের মতো অস্ত্র। ইট, পাথর জমিয়ে রাখা হল প্রত্যেক বাড়ির বিভিন্ন স্থানে। এমনকি গুলতি যা দিয়ে বাচ্চারা আমজাম পাড়ে কিংবা দুষ্টু ছেলেরা পাখিও শিকার করে সেটাও সঠিকভাবে কাজে লাগানোর মহড়া চলতে থাকল। অর্থাৎ যে-কোনো হামলা সাধ্যমতো প্রতিরোধ করার ট্রেনিং চলতে থাকল। মূলত এ সবই ছিল লড়াই করার মানসিক প্রস্তুতি। কারণ একটা জনযুদ্ধের আশঙ্কা ছিলই সকলের মনে। পুলিশ ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ এবং ধরপাকড় চলছিলই এদিক ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে। এদিকে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড লুটতরাজ। ছিঁচকে চোর এবং সুবিধাবাদী কিছু মানুষ নিচ্ছে এর সুযোগ। তারা বিভিন্ন দোকানপাট থেকে লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে এসে জমিয়ে রাখছে নিজেদের ঘরে অথবা কম পয়সায় বিক্রি করছে। ঢাকার একমাত্র ডিপার্টমেন্টাল স্টোর 'গ্যানিস' যেদিন লুট হল সেদিন আমাদের পাড়ার কিছু ছেলে বেশ কিছু জিনিস ওখান থেকে নিয়ে এসেছিল। বাবা পাড়ার ছেলেমেয়েদেরকে ডেকে এই বিষয়ে সাবধান করে দিলেন। এই ধরনের অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রবণতা প্রতিহত করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সবাইকে সংহত হতে হবে। আমরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে এই বিষয়গুলো ঘরে-ঘরে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকলাম।

ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামে যার যা-কিছু আছে তা-ই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ এবং ঘরে-ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান এবং মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর ৯ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা সকলের কর্মস্পৃহা বাড়িয়ে দিল কয়েকশো গুণ।

সমস্ত রকম প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও ময়দানে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে পারলাম না। মাম্প্‌স্ হওয়ার কারণে গাল ফুলে প্রচণ্ড ব্যাথা! মনে হচ্ছিল গালটা ফেটে শরীর থেকে বেরিয়ে আসবে! এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী হতে না পারার দুঃখ রয়ে যাবে চিরকাল। সেই ভাষণ রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচারের

কথা ছিল। রেডিও আগলে বসে থাকলাম যক্ষের ধনের মতো। কিন্তু ভাষণ প্রচারিত হল না। ভাগ্যকে দোষারোপ করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকল না। গালের ব্যাথা আর মনের কষ্ট কান্না হয়ে ঝরতে লাগল।

পরে শুনলাম সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সরাসরি সম্প্রচারে বাধা দেয়ার কারণে রেডিওর কর্মচারীরা প্রতিবাদস্বরূপ তাদের সমস্ত কাজই বর্জন করে। ফলে সেই দিন ঢাকা কেন্দ্রের সকল সম্প্রচারই বন্ধ হয়ে যায়। ৮ই মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের ব্যবস্থা করলে কর্মচারীরা কাজে যোগদান করেন।

সেই ভাষণ শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হল এবার সত্যি সত্যিই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তখন অনবরত শুধু কানে বাজছে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।' আমরা সমস্বরে স্লোগান দিচ্ছি 'জয় বাংলা, জয় বাংলা।'

জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্রের কর্মচারীদের এই বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভূমিকা এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সকল কর্মীর অবিস্মরণীয় অবদান মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করেছে। সমগ্র বাঙালি জাতিকে যুগিয়েছে অসীম সাহস ও উদ্দীপনা।

আমি নিয়মিত মিটিং মিছিলে যেতাম আর পাড়ায় একটু নেত্রী নেত্রী ভাব দেখাতাম বলে আমাদের বয়সী এবং একটু বড় ছেলেরা আমাকে খ্যাপাত 'ঝাঁসির রানী' 'চাঁদ সুলতানা' এসব বলে। মাম্প্স্ হওয়ার পর শুরু হল অন্য বিশেষণ। 'গাল ফোলা গোবিন্দর মা, আর মিছিলে যেও না' ইত্যাদি। মনে-মনে প্রচণ্ড রেগে গেলেও ভাব দেখাতাম যেন ওসব ছেলেমানুষি ব্যবহারকে আমি পাত্তাই দিই না।

যাই হোক, এর পর থেকেই অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করল। আমাদের ভেতর উত্তেজনার ঢেউ। প্রতিদিনই নানা ধরনের সংঘর্ষের কথা কানে আসছে। কোনটা সত্যি কোনটা গুজব বোঝার উপায় নেই। এই উত্তেজনা, এই অনিশ্চিয়তার মধ্য দিয়েই কেটে গেল আরো বারো-তেরো দিন। আমার মাম্প্স্ ততদিনে কমে এসেছে। ডাক্তার বলেছেন অন্ততপক্ষে দশ দিন বেডরেস্টে থাকতে হবে। কিন্তু তা-ই কি আর হয়! আমি লুকিয়ে-লাকিয়ে চলে যাই চারদিকের খবরাখবর নিতে।

জগন্নাথ কলেজের জনপ্রিয় ভি পি তুখোড় ছাত্রনেতা রাজিউদ্দীন আহমেদ (তখন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সাংসদ), প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা নাসিম আলী

(রফিক ভাই), তাঁর স্ত্রী আবেদা আপা, ন্যাপের হালিম ভাই, মণ্টু খান এঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং কর্মপদ্ধতি আলাদা হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁরা সকলেই ছিলেন একমত। দেশ ও দেশের ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং দেশের জন্য কিছু-একটা করার তাগিদ লক্ষ করে তাঁরা সবাই আমাকে স্নেহ করতেন এবং কিছুটা প্রশ্রয়ও দিতেন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে। আমি রাজনৈতিক প্যাঁচঘোঁচ বুঝতাম না, সরল মনেই আমার ভালোলাগা মন্দলাগা জোরালোভাবেই উপস্থাপন করতাম।

১৬ই মার্চ থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত দফায় দফায় ইয়াহিয়া খান, পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপ নেতৃবৃন্দ এবং জুলফিকার আলি ভুট্টো এলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠক করতে। সাধারণ মানুষ অধৈর্য হয়ে পড়ল। কারণ তারা কিছুই বুঝতে পারছে না, জানতে পারছে না দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। উনিশে মার্চ জয়দেবপুরে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষের খবরে সকলের মনেই আশঙ্কা জন্মেছে যে ভয়ানক কিছু-একটা ঘটতে যাচ্ছে।

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে ঘটল আরেক অভূতপূর্ব ঘটনা। সেদিন সবুজ সাদায় মেশা চাঁদ তারা খচিত ঝাণ্ডার স্থলে সবুজ প্রান্তরের বুকে গোলাকার রক্তরাঙা সূর্যের ওপর হলুদ রঙে বাংলাদশের মানচিত্র-সংবলিত পতাকা উঠল বাংলাদেশের মানুষের ঘরের ছাদে, অফিস আদালতে। অসংখ্য কাগজের পতাকা আগের দিন থেকেই বিলি করা হয়েছিল বিভিন্ন পাড়ায়। কেউ-কেউ কাপড়ের পতাকাও কিনে এনেছিল। পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পতাকা উড়িয়ে কুচকাওয়াজ করেছিল ছাত্রসমাজ।

দুপুরের দিকে দাদা একটা কাপড়ের পতাকা জোগাড় করে এনে একটা লম্বা সরু বাঁশের লাঠিতে বেঁধে ছাদের ওপর লাগিয়ে দিল সেই পতাকা। আমাদের সকলের মনে হল এইবার আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম। এখন থেকে আমরা আর পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ-বঞ্চনা আর ইচ্ছাশক্তির দাস নই। সারা পাড়ায় একটা হুলুস্থুল লেগে গেল। কাগজের পতাকা হাতে নিয়ে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে সারাটা পাড়া প্রদক্ষিণ করতে থাকল ছোট বড় টুকরো টুকরো দল। পরদিন অর্থাৎ ২৪ তারিখ সন্ধ্যার পর থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দেয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে প্রচুর বাঙালি সৈন্য ও সাধারণ মানুষ নিহত হওয়ার

সংবাদ পাওয়া যায়। বিহারি-বাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবরও ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। আমাদের নারিন্দা-দয়াগঞ্জ এলাকায় যে-কয়টি অবাঙালি পরিবার ছিল, তাদেরকে নিরাপদ রাখার জন্য, আমরা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি অবাঙালির ঘরে গিয়ে তাদেরকে আশ্বাস দিতে থাকি যেন তারা উদ্বিগ্ন না হয়। কোনো স্থানে কোনোরকম উত্তেজনার আভাস পেলেই তা প্রতিহত করার জন্য ছুটে যেতাম আমরা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা। এই উত্তেজনা এই উৎকণ্ঠা আতঙ্কে পরিণত হল ২৫শে মার্চ রাতে।

আমাদের পাশের বাড়ির রঞ্জন ভৌমিকের কাজ ছিল নানান খবর সংগ্রহ করে পরিবেশন করা। সেই কাজের দায়িত্ব সে নিজেই কাঁধে তুলে নিয়েছিল ছোটবেলা থেকেই। পৃথিবীর সব খবরই ছিল তার নখদর্পণে। আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম 'ভুয়া'। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম 'বিবিসি' 'আকাশবাণী', 'ভোয়া' না শুনে 'ভুয়া' শুনলেই সবখবর একসঙ্গে পাওয়া যাবে। সেই রঞ্জনই ২৫শে মার্চ রাত বারোটা কি সাড়ে বারোটার দিকে ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলো শেখ মুজিবর রহমানকে অ্যারেস্ট করে পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। যাবার আগে শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেছেন। আর মেয়ে-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ-শিশু-কিশোর নির্বিশেষে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চালাচ্ছে নৃশংস অমানবিক অত্যাচার এবং নিধনযজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং রাজারবাগ পুলিশ ফাঁড়ি রক্তাক্ত রণক্ষেত্র। যথারীতি ওর কথার সবটা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু আকাশে আগুনের লাল আভাই বলে দিচ্ছিল ভয়ঙ্কর কিছু-একটা ঘটেছে। পুড়ছে বাংলাদেশ।

সমগ্র পাড়া অতন্দ্র প্রহর কাটাচ্ছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায়। পরদিন সকালে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিতভাবেই জানা গেল। সন্ধ্যায় আবার রঞ্জন দৌড়ে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছে। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম রেডিওর ওপর। কিন্তু নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাতে ব্যাথা করে ফেললাম সারারাত, কিন্তু স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ধরতে পারলাম না। পরদিন সকালে অর্থাৎ ২৭ মার্চ অনেকেই বলল এ

ঘোষণা তারা শুনেছে এবং ২৭ তারিখ সকাল থেকে কয়েকবারই এ-ঘোষণা দেয়া হয়েছে ইংরেজি ও বাংলায়। শেখ মুজিবের হয়ে সে-ঘোষণা পাঠ করেছেন জিয়াউর রহমান নামের সেনাবাহিনীর এক মেজর এবং আরো দু'একজন। সেনাবাহিনীর সদস্যরা জনগণের সাথে আছে জানতে পেরে সাধারণ মানুষের মনোবল স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও সেনাবাহিনীর শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হল দুর্যোধন-দুঃশাসন-চেঙ্গিস-হালাকুর মানুষখেকো রক্ত। নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালিকে নির্বাক করে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নরপশুর দল। বিষাক্ত নখ আর ধারালো দাঁত দিয়ে রিরংসা ও পাশবিক নেশায় ছিন্নভিন্ন করল কিশোরী-যুবতীর নরম শরীর। বেয়োনেটের খোঁচায় রক্তাক্ত করে তুলল শিক্ষক-প্রকৌশলী-ডাক্তার-লেখক-সাংবাদিক-সংস্কৃতিকর্মীদেও দেহ। ছাত্র-জনতা, নারী-পুরুষ, শিশু কেউই রেহাই পেল না এই রক্তপিপাসু ক্ষমতালোভী শ্বাপদদের হাত থেকে। বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা-পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-সুরমা-কর্নফুলির ধারায় মিশে গেল মানুষের নোনা রক্ত। বঙ্গোপসাগরের মাটি-রং-জল হলো রক্তরাঙা এবং আরো লবণাক্ত। ভস্মীভূত হলো হাট-বাজার, গ্রাম-গঞ্জ-নগর-জনপদ। ভিটেমাটি ছেড়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে মানুষ, হিংস্র বাঘের তাড়া খেয়ে যেমন ছোটে হরিণশিশু।

২৫শে মার্চের পর থেকে প্রতিদিন যেসব বীভৎস পাশবিক ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে বাবা-মা প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় কাল কাটাতে লাগলেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন সদস্য নারিন্দার প্রখ্যাত উকিল সর্বজনশ্রদ্ধেয় আফসারউদ্দিন আহমেদ। আমরা দাদু বলে ডাকি। বাবাকে ডেকে জানালেন বাবার খবরাখবর জিজ্ঞেস করার জন্য অপরিচিত দুজন লোক এসেছিল। কালবিলম্ব না করে বাসার সবাইকে নিয়ে ঢাকা ত্যাগ করতে বললেন। আরো জানালেন, ওঁরাও সপরিবারে গ্রামের বাড়ি নরসিংদিতে যাচ্ছেন। আমাদেরও বললেন আপাতত ওখানেই যেতে, পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। ৩০ মার্চ ১৭ জনের বিশাল পরিবার সবকিছু পেছনে ফেলে রেখে পা বাড়ালাম অনিশ্চিত অজানা জীবনের উদ্দেশে। কারণ ঢাকা শহর তখন নরকের চেয়েও ভয়াবহ স্থান। যে-কোনো মুহূর্তে পাকসেনার দল টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারে তাদের ক্যাম্পে। অথবা ব্রাশ ফায়ারে অগণিত জীবন্ত মানুষকে মুহুর্তেই পরিবর্তিত করতে পারে মৃত্ত লাশে। বিশেষ করে যে বাড়িতে রয়েছে টগবগে তরুণ-তরুণী। কয়েক মাস আগে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার স্বামী প্রকৌশলী এস কে লালা তাঁর কর্মক্ষেত্র

সিরাজগঞ্জে। আমি ইন্টারমিডিয়েট প্রথমবর্ষের পরীক্ষা দেয়ার জন্য ছিলাম ঢাকায়। দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম দুই দিকে। কোনো সংবাদও পৌঁছানো গেল না। একটা পিকআপ গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন দাদু। কিন্তু লোকও তো অনেক– গাদাগাদি করে সবাই উঠেছি। আমাদের কুকুর কমরেডও এসেছে গাড়ির কাছে মার পাশে পাশে। হঠাৎ করেই ওর সামনের দুটো পা দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন বলতে লাগল আমাকে ফেলে চলে যেও না। আমরা সবাই ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছি। মা হাউমাউ করে কেঁদে বাবাকে বললেন, তোমরা যাও। আমি এখানে কমরেডের কাছে থাকি। ও তো আমার আরেকটি সন্তানের মতো। অনেক কষ্টে অনেক বুঝিয়ে প্রায় জোর করেই বাবা মাকে গাড়িতে ওঠালেন। গাড়ি চলা শুরু করল। গাড়ির পেছনে পেছনে অনেকটা দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কমরেড। একসময় হারিয়ে গেল দৃষ্টির অন্ত রালে। দেশ স্বাধীন হবার পর শুনেছি এক মিলিটারির পা কামড়ে ধরেছিল সে, সঙ্গে সঙ্গেই ওকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে।

আফসারউদ্দিন দাদুর বাড়িতে গিয়ে দেখি অনেক লোক। ওঁদের পরিবারও বড় পরিবার। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সস্ত্রীক চিত্রপরিচালক আলমগীর কবীর (ডঃ নীলিমা ইব্রাহীমের মেয়ে মঞ্জুলা ইব্রাহীম অর্থাৎ খুকু আপার স্বামী), পলি আপা ও বুলবুল (মাসিমার ছোট মেয়ে)-কে নিয়ে নীলিমা মাসিমার পরিবার। নীলিমা মাসিমা আবার আফসারউদ্দিন সাহেবের তৃতীয় ছেলে রাজিউদ্দিন আহমেদের শ্বাশুড়ি অর্থাৎ ডলি আপার মা। সকলের মুখেই একই কথা। কী করা যায়। কীভাবে করা যায়। কিছু তো করতে হবে। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসে আছি। আমি আর বুলবুল বসে আছি একটা সিঁড়ির ওপর। সামনের উঠানে কয়েকটা চেয়ার পাতা। নীলিমা মাসিমা আর আফসারউদ্দিন দাদু বসে আছেন। আলমগীর কবীর মাথা একটু ঝুঁকিয়ে পেছনে দুই হাত নিয়ে পায়চারি করছেন। হঠাৎ করে আলমগীর কবীর বললেন, খালার জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তিনি তো এক্কেবারে তোপের মুখে। প্রথমে বুঝিনি, আরো দুচারটে কথার পর বুঝলাম খালা মানে বেগম সুফিয়া কামাল। প্রথমে বুঝিনি, আরো দুচারটে কথার পর বুঝলাম খালা মানে বেগম সুফিয়া কামাল। নীলিমা ইব্রাহীম ডেকে বসালেন আলমগীর কবীরকে। বললেন, "হিন্দুদের পুরাণ পড়েছ কখনো? মা দুর্গার অনেক রূপ আছে জানো তো। তাঁর যেমন রয়েছে শান্ত কোমল রূপ, বিশ্বমাতৃকার রূপ, তেমনি তিনি যখন অসুরদলনী, দুর্গতিনাশিনী,

মহিষাসুরমর্দিনী তখন কিন্তু তিনি অজেয়, ভয়ঙ্করী।" আলমগীর কবীর একটু রুষ্ট হয়েই জবাব দিলেন, "আপনি তো জানেন এসব মিথ টিথ আমি বিশ্বাস করি না, ধর্মের প্রতিও আমার বিশেষ আস্থা নেই।" মাসিমা বললেন, এ তো মিথ নয়, ধর্মের কাহিনীও নয়। মেয়েরা ওইরকমই। মেয়েদের নিখুঁত চেহারা ঐ মা দুর্গা। বেগম সুফিয়া কামালও ঐরকম অজেয় অমর। পাক সেনারা তাঁর কেশ স্পর্শও করতে পারবে না। হঠাৎ করেই ভীষণ রকম একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। নীলিমা মাসিমার কথাগুলো আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করল।

কিছুক্ষণ পরেই ঝুপ করে সন্ধ্যা নামল। রাতের খাওয়ার পর বিভিন্ন ঘরে সকলের শোওয়ার ব্যবস্থা করা হল। একটা মাঝারি আকারের ঘরে সেমিডাবল একটি খাটের উপর নীলিমা মাসিমা শুয়েছেন পলি আপা আর আমার মিতা বুলবুলকে নিয়ে। আমরা চার বোন, খুড়তুতো দুইবোন, মা, কাকিমা এবং দিদিমণি নিচে ঢালা বিছানায় শুয়েছি। আমার পাশে দিদিমণি। ওঁর নাক ডাকার অভ্যাস আছে। কাজেই দিদিমণিকে ফিসফিস করে বললাম সবাই ঘুমাবার পর তুমি ঘুমাবে। তা নাহলে তোমার নাক ডাকার শব্দ সবাই শুনবে। দিদিমণি বললেন, আচ্ছা। যদি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি জাগিয়ে দিস। আমার ছোট দুইবোন পাশের থেকে আমার কথা শুনে খুকখুক করে হাসতে লাগল। আস্তে আস্তে সবারই চোখ লেগে এল। দিদিমণি আর ঘুমায় না। হঠাৎ খাটের উপর থেকে মেঘের গর্জনের মতো ঘর্ঘর ঘর্ঘর আওয়াজ শোনা গেল। নীলিমা মাসিমা উচ্চস্বরে নাক ডাকছেন। দিদিমণিকে বললাম এইবার তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পার। তোমার আওয়াজ পাশে থেকেও আমি শুনতে পাব না। আমার বোনেরা আবার খুকখুক করে হাসতে লাগল।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে আছি শুধু আমরা চারজন। মা, কাকিমা, দিদিমণি আর আমি। দিদিমণি আমার মায়ের মামিমা। ঢাকায় এসেছিলেন বেড়াতে। আমার দাদু, মামা ও মাসিরা আছেন হাসাইলে। এই নারকীয় পরিস্থিতিতে তিনি চলে এসেছেন আমাদের সঙ্গে। সংবাদ দেবার কোনো উপায় নেই। কাকু ছিলেন চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে কর্মরত। এখন কোথায় আছেন কেমন আছেন জানা নেই। আমার বিয়ে হয়েছে মাত্র কয়েক মাস। আমার স্বামী ছিলেন সিরাজগঞ্জে, সেখানকার পরিস্থিতি কেমন কে জানে! ঢাকায় এলেও আমাদের পাবে না। ওঁর বাবা-মা, ভাইবোন সবাই থাকে চট্টগ্রামে। ভাবছি, আমাদের কি আর কখনো দেখা হবে! মাথাটা সারাক্ষণ

ঝিমঝিম করছে। বুকের ভেতর বিশাল বরফের চাকার মতো আটকে আছে কান্না। সকলের সামনে আমার কান্না পায় না। শুধু মার কান্নার চাপা আওয়াজ পাচ্ছি। কাকিমাও আমার মতো উঠে বসে আছে। অন্ধকারেও টের পাচ্ছি।

ধীরে ধীরে অনেক সময় নিয়ে আরেকটা অন্ধকার রাত পার হল। একটু আলো ফুটতেই দরজার ডাশা খুলে বাইরে বের হলাম। একটা বাতাসের ঝাপটার সাথে ভেসে এল নাম-না-জানা ফুল-লতা-পাতার গন্ধ। পাখিরাও ঘুম ভেঙে জাগতে শুরু করেছে। হঠাৎ পায়ের কাছে একটা কিসের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে দেখি একটা কুকুর মুখ উঁচু করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুকের ভিতরটা হুহু করে উঠল। আমাদের প্রিয় কুকুর কমরেডও কি অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য? ও কি কাঁদছে?

পরদিন সকালবেলা চা-নাশতা করার পর আমাদের পরিবারের সবাই চলে গেলাম বিডি মেম্বার চেয়ারম্যান সুরেন দাশের বাড়িতে। সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন আফসারউদ্দিন দাদু। আমাদের সকলের হাতেই ছিল ছোট ছোট পোটলার মধ্যে কিছু জামাকাপড়, বিছানার চাদর আর অতি প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র, তুলো, ব্যান্ডেজ, ডেটল আর ছিল ছোট্ট একটা রেডিও।

কাকিমা বুদ্ধি করে আমার বিয়ের গয়নাগুলো একটা কাপড়ের পোটলায় বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন, কোমরে পেঁচিয়ে। ঢাকা থেকে বেরুনোর সময় ওগুলোর কথা কারো মনেই ছিল না।

কয়েকদিন পরের কথা। এপ্রিলের চার তারিখ। সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার দিকে আমি সুরেনবাবুর বাড়ির দোতলার ঘরে বসে রেডিও শুনছি। কখনো আকাশবাণী কলকাতা, কখনো আকাশবাণী আগরতলা, কখনো রেডিও পাকিস্তান ঢাকার অনুষ্ঠান। কোথায় কী ঘটছে তা জানার চেষ্টা করছি। মুক্তিযোদ্ধারা তখন পূর্ণ শক্তিতে পালটা আঘাত করছে। হঠাৎ ফাইটার প্লেনের বিকট শব্দে কানের পর্দা নড়ে উঠল। দৌড়ে বাবান্দায় এসে দেখি দুই তিনটা ফাইটার প্লেন আকাশে চক্কর দিচ্ছে। হুড়মুড় করে নিচে নেমে এসে মা কাকিমা এবং অন্য সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে এলাম বাড়ির পেছনের নিচু জমির কাছে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমার গার্লস গাইডের যুদ্ধকালীন ট্রেনিং অনুযায়ী সবাইকে বললাম কনুইয়ে ভর করে উপুড় হয়ে শুয়ে কানে হাত দিয়ে রাখতে। আমার দেখাদেখি সবাই তা করল। কয়েকবার চক্কর দিয়ে গোত্তাখাওয়া ঘুড়ির মতো শোঁ করে নিচে নেমে এসেই আবার উঠে যেতে থাকল প্লেনগুলো। মনে হল যেন আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। হঠাৎ দেখি কয়েকশো গজ দূরে খালের ওপারে নরসিংদি বাজার দাউদাউ করে জ্বলছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ওইভাবে থাকার পরে শেলিং বন্ধ হয়েছে বুঝতে পেরে ওখান থেকে উঠে এলাম। প্রচণ্ড দুর্গন্ধ এসে নাকে লাগল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম আমরা যেখানে শুয়েছিলাম সেটা মল নিষ্কাশনের জন্য কাটা খালের ঠিক উপরের দিকটা। আশেপাশে জমে আছে মলমূত্র। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল গুপ্ত কাকু, বাবা, দাদা এবং আমার খুড়তুতো ভাই আশিস বাজারে গিয়েছে। গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। নরসিংদি বাজারে আগুনের শিখা বেড়েই চলেছে। খাল পার হয়ে এদিকে আসছে

আধাপোড়া আর রক্তাক্ত মানুষ, কারো হাত নেই, কারো কান উড়ে গেছে, কারো এক পা নেই, অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে আসছে কেউ-কেউ। সে কী বীভৎস দৃশ্য!। দৌড়ে গেলাম মাঠ পার হয়ে খালের দিকে। আশিষ হাতে চালের ব্যাগ নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। বাসার কাছাকাছি আসতেই ব্যাগ ফেলে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে মাথায় জল ঢালার পর জ্ঞান ফিরলে অন্য সকলের কথা জিজ্ঞেস করলাম, ইশারায় জানাল ও জানে না। কিছুক্ষণ পর দেখি একজন লোককে ধরাধরি করে নিয়ে বাবা আর গুপ্ত কাকু আসছে। লোকটার একটা হাত বাহু থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত শরীর। চিৎকার করে শুধু বলছে "আমার হাতটা ক্যাইট্যা ফ্যালান, নাইলে টান দিয়ে ছিড়া ফালান-আমি আর সহ্য করতে পারতাছি না।" আমার ফার্স্ট এইড বক্সের সমস্ত তুলা ব্যান্ডেজ, মায়ের একটা শাড়ি, ডেটল শেষ হয়ে গেল কিন্তু কিছুই করা গেল না। রক্ত পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে নিথর হয়ে গেল দেহটা। দাদা তখনো ফেরেনি। আমরা ছুটলাম দাদার খোঁজে বিভিন্ন দিকে। মাঠের অপর প্রান্তে একটা জটলা দেখে দৌড়ে সেখানে গেলাম। দেখি এক মহিলার গালের একপাশ উড়ে গেছে। মৃত মহিলার এক দেড় বছরের অবুঝ শিশুর আর্তনাদ আর বৃদ্ধ পিতার আহাজারিতে বাতাস থমকে আছে। একটা গাছের নিচে বোবার মত দাঁড়িয়ে আছে দাদা। দৌড়ে গিয়ে ঝাঁকি দিতেই মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকল আর গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকল। কয়েকজন লোক ধরাধরি করে নিয়ে এল দাদাকে। বাবা আর গুপ্ত কাকুও ততক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। মাকে জড়িয়ে ধরে দাদা কেমন অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো বলতে থাকল "মাটা মরে গেল, বাচ্চাটা আর বুড়োটা কাঁদছিল।" মৃতদেহগুলোর পাশে কিছু নয়নতারা ফুল ছিঁড়ে রেখে এলাম।

আবার শুরু হল পথ চলা। কারণ নরসিংদি মুক্তিযোদ্ধাদের একটি প্রধান ঘাঁটি। এখানে আবার বম্বিং হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর পাকসৈন্য তো যে-কোনো সময় আসতে পারে। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাই বাবা-কাকুকে বলল এই স্থান ত্যাগ করে আরো ভেতরের দিকে চলে যেতে। আমরা আশ্রয় নিলাম আদিয়াবাদ স্কুলে। আফসারউদ্দিন দাদুর বাসার সবাই আমাদের খোঁজখবর রাখছিলেন প্রতিদিনই। সেদিনই দুপুরের দিকে কাকু এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

চন্দ্রঘোনা থেকে ঢাকায় পৌঁছে প্রতিবেশীদের কাছ থেকেই খবর পেয়েছেন আমরা নরসিংদিতে গেছি। কাকুর ছোট মেয়ে ইন্দ্রাণী জড়িয়ে ধরলো বাবাকে।

কাকিমার চোখে আনন্দাশ্রু। আমার স্বামীর খবর তখনো পাইনি। কোথায় আছে কেমন আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না, কিছু জানি না।

পরদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ কয়েকজন এসে খবর দিল, পাকিস্তান আর্মির একটি দল এদিকেই আসছে। হুড়মুড় করে আমরা ছুটলাম পাশের গ্রামের দিকে। ধানক্ষেত, আখক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটতে গিয়ে ধারালো কচি পাতায় ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হতে থাকল হাত পা। কাদায় পা আটকে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে ত্বরিত গতিতে উঠে আবার ছোটা। ক্ষেত পেরিয়ে একটা ঝোপের কাছে আসতেই, কয়েকটা টর্চলাইটের আলো এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগল। ভয়ে হাত-পা হিম। নিশ্বাস বন্ধ করে সবাই বসে। ঝিঁঝি পোকার শব্দ তো নয়, যেন কোনো জংশন স্টেশনের অবিরাম ট্রেনের আনাগোনা। টর্চের আলো যত কাছে আসতে লাগল, ততই হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হতে থাকল। মনে হল সবাই আবার বুকের ধুকপুক শুনতে পাচ্ছে। একসময় প্রায় আমাদের ঝোপ ঘেঁষেই তিন-চার জন লোক চলে গেল। বাংলা কথা শুনে একটু স্বস্তি পেলাম। টর্চের আলো একটু দূরে সরে যেতেই আমরা আবার চলা শুরু করলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ক্ষেতের নরম কাদা আর জলের সপসপ শব্দ। কেমন যেন একটা ভৌতিক পরিবেশ। বাবা মাঝে মাঝে অনুচ্চস্বরে সবার নাম ধরে ধরে ডেকে সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিচ্ছেন। একটা আলোর নিশানা ধরে আমরা এগুচ্ছিলাম। আলোর উৎসের কাছাকাছি আসতেই আমরা বুঝতে পারলাম এটা এই গ্রামের কোনো অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ি। চারপাশের টিনের ছাউনি দেয়া পাকা ঘর মাঝখানে বড় উঠান। আমাদের সঙ্গে আশপাশের গ্রামের দুতিনজন লোক ছিলেন পথপ্রদর্শক হিসাবে আর আছেন জয়নাল কাকা, আফসারউদ্দিন দাদুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তাঁরাই বাড়ির মালিকের সাথে কথা বললেন। বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর আমাদের থাকতে দেয়া হল। সমস্ত ঘরে খড়বিচালি ভরা। চার-পাঁচটা ছাগল বাঁধা খুঁটির সঙ্গে। একটা সরু তক্তপোশের ওপর তেলচিটচিটে দুটো বালিশ। একটা টিনের কুপি জ্বালিয়ে দেয়া হল ঘরটাতে। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়ার মতো একটা আশ্রয় জুটল। মাথার ওপর একটা ছাদ তো রয়েছে। তক্তপোশের ওপর আমরা মহিলা সদস্যরা উঠে বসেছি। পায়ে একটু শিরশিরে চুলকানির মতো ভাব হওয়ায় গোড়ালির উপর শাড়িটা একটু তুলতেই ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। প্রায় গোঙানির মতো আর্তচিৎকার উঠে এল। প্রায় প্রত্যেকের পায়েই পাঁচ-ছয়টা করে জোঁক রক্ত খেয়ে ঢোল হয়ে

উঠেছে। বাবা, কাকু আর দিদিমণি হাত দিয়ে টেনে টেনে সেই জোঁক ফেললেন। এবার আমার দিদিমণিই গেলেন বাড়ির ভেতরে এবং কী আশ্চর্য, কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধার সঙ্গে দুটো মাটির খুরায় লবণ-জলের মিশ্রণ আর নিমপাতা আর কী কী সব পাতাবাটা নিয়ে ঢুকলেন। প্রথমে লবণ-জল দিয়ে সবার পায়ের ক্ষত ধুয়ে পাতার মলম লাগিয়ে দিতেই জাদুমন্ত্রের মতো রক্ত এবং জ্বলুনি দুটোই বন্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণ পর টের পেলাম ছাগলের মলমূত্রের তীব্র গন্ধ। সারারাত ধরে কিছুক্ষণ পরপরই কোনো-না-কোনো ছাগল তাদের প্রাকৃতিক কর্ম করতে থাকল। হয়তো ওরাও এতগুলো অপরিচিত মুখ দেখে ভয়েই এমন করছিল। খড়ের গাদার ওপর বসে বাবা, কাকু, দাদা সবাই ছাগলের মলমূত্রের ছিটে এবং দুর্গন্ধ হজম করেই বসে থাকল সারারাত।

পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু হল। এমনি করে সারাদিন ধরে মাইলের পর মাইল হাঁটা। ক্ষুধা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লে কোনো বাড়ি থেকে বা রাস্তার ধারের টিউবওয়েল থেকে এক আঁজলা জল, এক মুঠ চিড়া বা মুড়ি খেয়ে আবার হাঁটা। এরই ফাঁকে ফাঁকে কোনো বড় গাছের ছায়ায় কিংবা পরিত্যক্ত কোনো বাড়ির বারান্দায়, পুকুরঘাটে বসে বাবা আগামী দিনের পরিকল্পনা করে নিতেন। সে-সময় অমূল্য রত্নের মতো যে-জিনিসটাকে আমরা আগলে রাখতাম, তা হল ছোট্ট একটা ট্র্যাঞ্জিস্টার রেডিও। বাবা প্রথমদিনই নরসিংদি বাজার থেকে বেশ কিছু ব্যাটারি কিনে রেখেছিলেন। সুযোগ পেলেই আমরা আকাশবাণী, বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকার খবর শুনতাম। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠান সবসময় পাওয়া যেত না। হঠাৎ-হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার অংশবিশেষের প্রচার শুনে শুনে আমার ৭/৮ বছরের দুই ভাই বঙ্গবন্ধুর অনুকরণে বক্তৃতা দিত। "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মাটিকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ .. .. ..। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম– জয় বাংলা"। আমরা সবাই মিলে সমস্বরে বলে উঠতাম, "জয় বাংলা।" ঈশ্বরের কাছে শুধু প্রার্থনা করতাম, স্বাধীনতার জন্য কিছু-একটা করার সুযোগ করে দাও। তারপর যদি মৃত্যু আসে, কোনো আক্ষেপ থাকবে না। এভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় পাকসেনার হাতে যেন প্রাণ না যায়। কিন্তু মনে-মনে সকলেই প্রস্তুত ছিলাম নেহাতই যদি তেমন পরিস্থিতি হয় তবে গাছের ডাল হোক, পাথর হোক, লোহার রড, খুন্তি কুড়াল যা-ই পাব তা দিয়েই শত্রুপক্ষের দুএকটা মেরেই মরবো। তার আগে আমি মরবো না, কিছুতেই না।

বাবা একসময় ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন। তেমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সেই ট্রেনিং দিতেন। আমাদের প্রত্যেকের হাতেই কিছু-না-কিছু অস্ত্র ছিলই। দলের ছেলেদের কাছে ছিল বল্লমের মতো ছুঁচোলো করা বাঁশ। দুতিনটে বাঁশ একত্র করে বাঁশের দুইধারে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। প্রয়োজনে সেই বাঁশই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমি লুকিয়ে কয়েকটা করবী গোটার শাঁস ভেঙে কাগজের পুটলিতে বেঁধে নিয়েছিলাম, আমার শাঁড়ির আঁচলে। শুনেছি করবী গোটা অত্যন্ত বিষাক্ত, খেলে মানুষ মরে যায়। তেমন পরিস্থিতি হলে তা-ই খেয়ে ফেলব। আমি সে-সময় প্রীতিলতার আদর্শে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত।

একদিন দুপুরবেলা পরিশ্রান্ত আমরা সবাই এসে বসেছি একটা শানবাঁধানো পুকুরের ধারে সবুজ ঘাসের ওপর। খানিকটা দূরে একটা সুদৃশ্য টিনের বাড়ি। একটা বাঁধানো ইঁদারাও দেখা যাচ্ছে বাড়ির বাইরের উঠানের কাছে। হঠাৎ কয়েকজন লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। কারো খালি গা, কারো গায়ে গেঞ্জি, কেউ শার্ট পরা কিন্তু সকলেরই পরনে লুঙ্গি। ট্রাউজার বা প্যান্ট পরা কেউ নেই। ধবধবে ফর্সা গেঞ্জি পরা ঢ্যাঙামতো লোকটা এসেই আমার বাবার সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। আমরা কোত্থেকে এসেছি, কীভাবে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি প্রশ্ন। বাবার উত্তর শুনে হঠাৎ প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে বলে উঠল "আমার নাম দাঁত কিরমিরা জব্বার ডাকাইত। আমি গত পনেরো বচ্ছর ধইরা চলন্ত ট্রেনে ডাকাইতি করি। দশ-বারোটা খানসেনা খতম কইরা দেওন আমার কাছে কিচ্ছু না। আপনেরা আমার মেহমান। যতদিন মন লয় এইখানে থাকেন, খান দান আর নিশ্চিন্তে ঘুমান। আপনেগো গায়ে টোকা দেওনের মানুষ এই তল্লাটে আইতে পারব না। মুক্তিযোদ্ধারা সবাই আমার বন্ধু।" প্রথমে ওর কথা বলার ভঙ্গি আর চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেলেও, অবাক হয়ে লক্ষ করলাম বড় বড় উঁচু উঁচু দাঁত কিড়মিড় করে অদ্ভুতভাবে কথা বলার মধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে রয়েছে একধরনের সরলতা এবং সততার অভিব্যক্তি। একটু থেকে আবার বলল, "আমার বাড়িতে চাইরটা চুলা আছে। একটা মুসলমানের, একটা হিন্দুর, একটা খ্রিষ্টানের আর অন্যটা বৌদ্ধদের জইন্য। আপনাদের কোনো চিন্তা নাই। চাইল ডাইল আনাজপাতি সব আছে আমার ঘরে। এই পুকুরও আমার, ওই কুয়াও আমার সব গ্রামের মানুষও আমার।"

একালের রবিনহুডকে দেখে একদিকে বিস্ময়, অপরদিকে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গেলাম। বাবা বললেন "আপনারও এত চিন্তা করার কারণ নাই। আমরা জাতপাত মানিনা। আমাদের কিছু চাল ডাল দিলে খিচুড়ি বানিয়ে আমরা খেয়ে নেব। আপনার সহযোগিতা আমরা কোনোদিন ভুলব না। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

জব্বার ডাকাত আমাদের সেই ঝামেলাও করতে দিলেন না। নিজের বাড়িতেই সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা করলেন। ইতোমধ্যে ক্ষেতের খিরাই, গাছের ডাব এবং ইঁদারার অপূর্ব সুস্বাদু জল খেয়ে আমাদের শ্রান্তি-ক্লান্তি কোথায় চলে গেল! সবচেয়ে বড় কথা গ্রামের মানুষগুলোর আন্তরিক ব্যবহার আমাদের সবার হৃদয় ছুঁয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতেই বেলাবেলি আমরা বেরিয়ে পড়লাম আরো ভেতরের দিকে চলে যাওয়ার জন্য। জয়নাল কাকা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। আমরা যখন সাউধ পাড়া নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এতটা পথ একটানা হেঁটে আসায় সবাই প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মহিলা ও শিশু-সদস্যরা। এত হাঁটার অভ্যাস তো কারুরই নেই। এ-গ্রামেও একটা পুকুরের ধারে এসেই আমরা সবাই মিলে বসলাম। সবুজ ঘাসের চাতাল ছাড়িয়েই লাল পোড়া ইটের একটা বাড়ি, পাশে একটা ভাঙাচোরা মন্দির। আমরা জল খাওয়ার জন্য বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। দেখি বেশ অনেক লোক। ভাত আর ডাল রান্না হচ্ছে বড় বড় তামা পেতলের হাঁড়িতে, অনেকেই যাকে বলে ড্যাগ। বড় হাতলওয়ালা কাঁসার হাতা দিয়ে বালতিতে করে নিয়ে পাত পেড়ে খাওয়ানো হচ্ছে অনেক লোককে। প্রথমে ভাবলাম হয়তো কোনো উৎসব হচ্ছে। পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যারা খাচ্ছে তারা কেউই গৃহস্বামীর আত্মীয় বা পরিচিত লোক নয়। এরাও আমাদের মতো দূর-দুরান্ত থেকে এসেছে। বাবা-মা-ভাইবোন আত্মীয় স্বজন হারিয়েছে এদের অনেকেই। মানবিকতার কারণেই গৃহস্বামী এবং তাঁর সহধর্মিণী উদ্বাস্তু মানুষ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ডাল-ভাত খাইয়ে একরাত থাকার জায়গা দিয়ে সাহায্য করছেন। এমন অনেক বিশালহৃদয়ের মানুষের নাম বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে লেখা নেই। আমরাও স্বার্থপরের মতো সেই রাত খাওয়াদাওয়া করে, রাতে থেকে, ভোরবেলা তাঁদের অনুরোধে পথে খাওয়ার জন্য মিষ্টিআলু সেদ্ধ, চিড়া-গুড় নিয়ে নৌকায় উঠেছি, আজ এতদিন পর তাঁদের কীর্তির কথা মনে রেখেছি কিন্তু ভুলে গেছি সেই মহাত্মাদের নাম।

অনেক বড় একটা নৌকায় আমরা কুড়ি-বাইশজন লোক। আমাদের পরিবারের সতেরোজন সদস্য ছাড়া আর আছেন জয়নাল কাকা। আছে মাঝিমাল্লাদের কয়েকজন। সম্ভবত মেঘনা নদী দিয়ে পার হচ্ছিলাম আমরা। বেশ খানিকটা এগুতেই উলটোদিক থেকে আসা একটা নৌকার লোকজন বলল আর সামনে না যেতে। কারণ সেখানে রয়েছে মিলিটারির গানবোট। আমাদের মাঝি আস্তে আস্তে নৌকা তীরের দিকে নিয়ে গেল। কাঠের পাটাতন দেয়া একটা ঘাটের কাছে এসে নৌকা ভিড়ল। সুন্দর সবুজ মায়াময় একটি গ্রাম। আমরা গিয়ে বসলাম একটা স্কুলের বারান্দায়। গ্রীষ্মের বন্ধ চলছিল স্কুলে। তাই শান্ত, কোলাহলহীন। গ্রামের নামটাও কী কাব্যিক– শ্যামগ্রাম!

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা এসে পৌঁছেছি শ্যামগ্রামে। কুমিল্লার নবীনগরের কাছে নদীর পাশ-ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সেই গ্রামের সহজ সরল সাধারণ মানুষ দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তখনো পুরোপুরি টের পায়নি। আমাদের কথা শুনে সে-গ্রামের একজন অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ প্রাণবল্লভ বাবু তার বাড়ির বৈঠকখানায় আশ্রয় দিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই আমরা তাঁদের ঘরের মানুষের মতোই হয়ে গেলাম। প্রতিদিন দুধ, দই, ছানা-মিষ্টি, নাড়ু –মুড়ি পুকুরের বিশাল বিশাল মাছ, খাসির মাংস, রীতিমতো উৎসব চলল চার-পাঁচ দিন। আমরা গত কুড়ি বাইশ দিন কোনোদিন না খেয়ে, কোনোদিন আধাপেটা খেয়ে শারীরিকভাবে কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এবার যেন একটু শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ এল। বিধাতাই হয়তো আমাদের সে-সুযোগ করে দিয়েছিলেন। একদিন পুকুরে স্নান করার সময় হঠাৎ করে খেয়াল করলাম আমার গলার চেনটা নেই। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। বড় চৌকোনা একটা পান্নার লকেটসহ উপহারটি দিয়েছিল লালাবাবু। শুভরাত্রির প্রথম উপহার। উথালপাথাল– নানা অশুভ ভাবনা শুরু হল মনের ভেতর। এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে? কীভাবে আছে! আঁতকে ওঠার চাপা আর্তনাদ আর ভয়ার্ত চেহারা দেখে আমার চেয়ে বেশ ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "দিদি, কী হয়েছে?" বললাম, "আমার গলার চেনটা খুলে পড়ে গেছে পুকুরে। একটা বড় সবুজ লকেট লাগানো।" বাচ্চাগুলো ডুব দিয়ে দিয়ে খুঁজতে লাগল লকেটসহ সেই চেন। প্রায় আধঘণ্টা পার হয়ে গেল, কিন্তু হদিশ মিলল না আমার স্বামীর দেয়া সেই উপহারের। শ্লথ পায়ে উঠে এলাম পুকুরঘাটে। মনে পড়ছে অনেক কথা। চোখের জল কিছুতেই বাধা মানছে না। একসময় বাড়ির ভেতর দিকে পা

বাড়ালাম। কিছুদূর আসতেই পেছন থেকে একদল ছেলেমেয়ের হর্ষোৎফুল্ল চিৎকার শোনা গেল, "দিদি, পাইছি; পাইছি দিদি আপনার চেন আর লকেট।" ওদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম একটি ছেলের হাতে উঁচু করে ধরা হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে ঝুলছে আমার গলার হারের কিছুটা অংশ। ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। আমার পায়ে যেন কেউ গজাল ঠুকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ স্থাণুর মতোই দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাড়িতে ঢোকার সদরদরজায় আমার স্বামী। গৃহস্বামিনী একজন বৃদ্ধ মহিলা যাঁকে আমরা দিদু সম্বোধন করতাম, উনি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কলকল করে হেসে হেসে রসিকতা শুরু করলেন। আর এতেই পরিস্থিতিটা সহজ হয়ে গেল। দিনটা ছিল ১৯ এপ্রিল। আমার বাবা-মার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে একটা স্বস্তির আভা ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের দুজনের শোবার ব্যবস্থা হল দোতলার ঠাকুরঘরে। ওটাই ছিল গৃহকর্ত্রীর নির্দেশ। আমাদের খুবই সঙ্কোচ হচ্ছিল। দিদি বললেন, "জানস, আমার কথা এই বাড়িতে কেউ অমান্য করে না, আরে তোরাই তো আমার লক্ষ্মী-নারায়ণ।" এখন ভাবি, একজন হিন্দু ঘরের বয়স্কা নারী কত সহজে তাঁর ঠাকুরঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন আমাদের জন্য শুধু এই ভেবে যে সদ্যবিবাহিত আমাদের বেশ অনেক দিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর আজই পুনর্মিলন ঘটেছে।

এপ্রিলের শেষ প্রান্তের কোনো এক দিন নদীর ওপারে নবীনগর জ্বলে উঠল দাউদাউ করে। তার আঁচ এসে লাগল শ্যামলাবরণ শ্যামগ্রামে। নদী পার হয়ে নৌকায় করে আসতে থাকল অসংখ্য আহত নিঃসম্বল মানুষ। আবার শুরু হল পথ চলা। ইতোমধ্যে বাবা এবং পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা সীমান্ত অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আগরতলা সীমান্তের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। কিন্তু সেখানে পাকআর্মির একটা শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। কিছুক্ষণ পরপরই একটা করে হেলিকপ্টার আকাশে চক্কর খায় আবার চলে যায়। বাবা বললেন, উপায় নেই। এরই ফাঁকে ফাঁকে আমাদের ওপারে চলে যেতে হবে। ছোট ছোট তিনটে দলে ভাগ হয়ে গেলাম আমরা। প্রতি দলে পাঁচ-ছয়জন সদস্য। একটা রেললাইন পার হতে হবে। দুজন আর্মি গার্ড মাঝে মাঝেই পায়চারি করছে তার ওপর দিয়ে। ওরা একটু দূরে গেলেই একদল করে পার হব সেই পরিকল্পনামতো প্রথম দুটি দল নিরাপদেই পার হয়ে গেল। সবার শেষে আমরা। আমার স্বামীর কাঁধে আমার তিন বছরের ছোট বোন অন্য হাতে বাঁশের বল্লমের

আগায় বাঁধা কাপড়ের পুটুলি। বাবা আমার আর সেজো বোনের হাত ধরে রেখেছেন তাঁর পেশিবহুল শক্ত হাতে। রেললাইন ক্রস করতে যাওয়ার মুহূর্তেই ঘরঘর আওয়াজ করে উড়ে উড়ে চক্কর লাগাতে থাকল হেলিকপ্টারটা, প্রায় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। স্পষ্টই দেখলাম দুজন পাকসেনাকে। ওপরে তাকাতে গিয়ে রেললাইনের স্পারে হোঁচট খেয়ে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। বুড়ো আঙুল উলটে দরদর করে রক্ত পড়তে থাকল। বাবা এক হ্যাঁচকা টান মেরে কোমর ধরে প্রায় শূন্যে তুলে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটলেন। আমার স্বামী ঘুরে পেছনে ফিরতেই বাবা দিলেন প্রচণ্ড ধমক। আমরা ঢুকে পড়লাম ছোটখাটো একটা জঙ্গলের মধ্যে। এক বৃদ্ধ আমাদের অবস্থা দেখে দুহাত তুলে প্রার্থনা করলেন, "হে খোদা, এই কচি কচি বাচ্চাগুলোকে রক্ষা করো, শয়তানদের শাস্তি দাও। পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করো খোদা।" আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন, ভয় পাস না বেটি, সব ঠিক হয়ে যাবে। ভারতের মাটি স্পর্শ করলাম আমরা। মনে হল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নবজীবন লাভ করলাম যেন।

শুরু হল জীবনের আরেক অধ্যায়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী কলকাতা। গান গাওয়া, নাটক করা, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠন করা, কাপড়চোপড়, খাবার, ওষুধপত্র সংগ্রহ করে বিভিন্ন ক্যাম্পে বিতরণ, যে যেভাবে পেরেছি সর্বশক্তি দিয়ে স্বাধীনতার জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করেছি। ভারতের– বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, ব্যবসায়ীসহ সকল পেশার সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সহানুভূতি দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁদের ঋণ শুধু কৃতজ্ঞতা দিয়ে পরিশোধ করা যাবে না।

আগরতলা কৃষ্ণনগরে আমার কাকিমার মামা ধীরেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম ১৯ সদস্যের বিশাল পরিবার। অসীম মমতায় আমাদের কাছে টেনে নিলেন পরিবারের সকল সদস্য। দিদিমণি যেমনই মমতাময়ী তেমনই আনন্দময়ী। তাঁদের দুই মেয়ে কৃষ্ণা-শুক্লা আর দুই ছেলে পার্থ-অমিত। সকলেই খুব হাসিখুশি প্রাণচঞ্চল। সম্পর্কে কৃষ্ণা-শুক্লা আমার মাসি হলেও বয়সে আমার ছোট। কৃষ্ণা-শুক্লা আমাকে ওদের বন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে যেত আর বলত, এটা আমার মাসি। ওরা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। ও রেডিও-টিভির আর্টিস্ট। সকলেই একটু যেন সমীহ করত। রেডিও-টিভির আর্টিস্ট বললে মনে হতো রেডিও-টিভির আর্টিস্টরা এই জগতের কেউ নয়। কলকাতা এবং আগরতলায় তখনো টেলিভিশন চালু হয়নি। সুতরাং টিভি তাদের কাছে একটা স্বপ্নের জগৎ।

পরের দিন খবর পেলাম শরণার্থী শিবিরে আমার ননাসের স্বামী কানুনগো পাড়া কলেজের অধ্যাপক অংশুমান হোড় এসেছেন সপরিবারে। আমরা আমাদের

সঙ্গে আনা দুতিনটা শাড়ি একটা সতরঞ্জি এবং আগরতলার দাদু-দিদিমণির বাসা থেকে গোটা তিনেক বালিশ আর বিছানার চাদর নিয়ে আমি, লালাবাবু, আমার বাবা, গুপ্ত কাকু সবাই মিলেই গেলাম সেখানে। আমার শ্বশুরবাড়ির খবর জানার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলাম। গুপ্ত কাকুর বাড়িও চট্টগ্রামে। সেখানে রয়েছেন তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা এবং ভাইবোনেরা।

শরণার্থী শিবিরে দেখা হল তাঁদের সঙ্গে। ছোট ভাইকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বড়দি। খবর পেলাম আমার ছোট ননদের দেবর দিলীপ চৌধুরী যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। সাতকানিয়া কলেজের অধ্যাপক আমার ভাশুর অসিত লালাকে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। পরে অবশ্য শুনেছিলাম যে, তথ্যটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু অসম্ভব জনপ্রিয়তার কারণে ছাত্ররাই তাঁকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ির খবরও জানতে পারলাম ভাসাভাসা। গুপ্ত কাকু তাঁর পরিবারের সদস্যদের কথা জানতে পেরে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। দেখা হল আমার ভাসুরের প্রাক্তন ছাত্র আগরতলার কোনো একটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক নির্মলেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন ত্রাণশিবির পরিচালনা পর্যদের একজন। দুএকদিন পর নির্মলবাবুর সাথে দাদুর বাসায় এলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহমেদ ছফা। তিনি লালাবাবুদের দুতিন বছরের জুনিয়র। তাঁর কাছ থেকে বাংলাদেশের অনেক খবরই পাওয়া গেল। তিনি বর্ণনা করলেন কীভাবে তিনি পাকসেনাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এলেন। তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল তিনজনের একটি দল। দরজার বাইরে বুটের ঘন-ঘন লাথি, ভেতরে গেঞ্জি -গায়ে লুঙ্গি-পরা আহমেদ ছফা ভাবছেন কী করবেন। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল। বাথরুম থেকে শলার ঝাড়ু-হাতে নিয়ে গায়ে একটু ময়লা আর জল লাগিয়ে দরজা খুলে একটু চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ""কয়া হ্যায়, কেয়া মাংতা? দরওয়াজা তোড় দোগে কেয়া?" এই প্রশ্নে পাক সেনারাও যেন একটু হকচকিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "আহমদ ছফা কাঁহা হ্যায়? উনকো বোলাও।" ছফা ভাই বললেন, "উয়ো তো আভি আভি নিকলা, বাদ মে আনা।" ওরা আবার জিজ্ঞেস করল, "তুম কৌন হো?" ছফা ভাই বললেন, "দেখতা নেই কেয়া? ম্যায় জমাদার হুঁ।" ওরা চলে গেল এই ফাঁকে ছফা ভাই পালিয়ে এলেন। কাহিনীটা বলেই ছফা ভাই আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওরা বিশ্বাস করল আমার কথা। নিখুঁত অভিনয় আর চেহারা

দেখে কোনোই সন্দেহ হল না। চেহারাটা জমাদারের মতোই কি না।" বলেই হো হো করে হাসতে লাগলেন। ওঁর বাচনভঙ্গিতে এত দুঃখের মধ্যেও হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে গেল।

এবার আমাদের উনিশজনের পরিবারের বিচ্ছিন্ন হবার পালা। গুপ্ত কাকু, যিনি আমাদের ছোট্টবেলা থেকেই আমাদের পরিবারের সদস্য, তিনি চলে গেলেন তাঁর বোনের কাছে আসামে। আমাদের বুক ভেঙে যেতে লাগল। ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিলাম না। আবার যে কবে কাকুর সাথে দেখা হবে! এত কষ্টের মধ্যেও সবাই একসাথে ছিলাম, এর একটা শক্তি ছিল। এরপর কাকিমা ও আমার খুড়তুতো ভাইবোনদের কৃষ্ণনগর রেখে কাকুসহ আমরা চলে যাচ্ছি বহরমপুর, যেখানে আমার ছোটকাকু থাকেন। তিনি বহরমপুর সেণ্ট্রাল জেলের চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট। কাকিমার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। কাকিমা আমার মতো। কারো সামনে কাঁদতে পারে না। মা হাউমাউ করে কাঁদছে। বাবা কাকিমাকে বললেন, "তুমি চিন্তা কোরো না, মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হলে বেণু (কাকুর ডাকনাম) তোমাদেরকে এসে নিয়ে যাবে। আর চিঠিপত্র লিখবে নিয়মিত।" এতক্ষণে ছোট্ট ইন্দ্রাণী বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "জেঠুমণি তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমরা যাব না?" অসম্ভব শক্ত মনের মানুষ বাবারও চোখের কোনা ভিজে উঠল এই প্রশ্নে।

আগরতলার কৃষ্ণনগর থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত বাসে, তারপর রেলপথে লামডিং হয়ে বহরমপুর। ঘূর্ণির মতো পাহাড়ি রাস্তা। মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে বাস গভীর খাদে পড়ে যাবে। পাকসেনাদের হাত থেকে বেঁচে এসে শেষকালে বাসদুর্ঘটনায় মৃত্যু! কিন্তু নাহ! আমরা নিরাপদেই বাসের ভীতিপ্রদ ভ্রমণ শেষ করলাম। শুরু হল রেলগাড়ির যাত্রা। সকলেই শরণার্থী। ঘামের গন্ধে, বমির গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে। শরণার্থীদের জন্য এই বিশেষ ট্রেনে প্রায় তিন দিনের যাত্রাশেষে বহরমপুর এসে পৌঁছলাম।

বহরমপুর যাওয়ার পথে কয়বার ট্রেন বদল করলাম সেটা খেয়াল করার মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে বাবার নির্দেশমতোই সবকিছু করছি আমরা। বাবা ব্রিটিশ আর্মির ট্রেনিংপ্রাপ্ত মিলিটারি মেজাজের মানুষ। সব ধরনের পরিস্থিতিতেই কীভাবে মানিয়ে নিতে হবে তা তিনি রপ্ত করেছিলেন ভালোভাবেই। তাঁর দুরন্ত সাহস আর সহনশীলতাও অনুকরণযোগ্য। ট্রেনের দুলুনি আর ক্লান্তিতে মানুষের ভিড় আর প্রচণ্ড দুর্গন্ধের মধ্যেও বারবার

ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎহঠাৎ জেগে লক্ষ করতাম কোনো স্টেশনের নাম, যা হয়তো গল্পের বইয়ে বা ইতিহাসের পাতায় পড়েছি। পরিচিত নামগুলো দেখলে মনের ভেতর অজান্তেই কেমন একটা খুশির অনুভূতি জাগ্রত হতো। যেন অনেক অপরিচিতদের মধ্যে পরিচিত কারো সাক্ষাৎ পেলাম।

ভোরের দিকে গাড়ির গতি একটু শ্লথ হতেই তন্দ্রা ভেঙে গেল। একটা স্টেশনের নাম দেখে ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। মনের ভেতর উথাল-পাথাল ঢেউ। একসময় সহস্র পলাশ ফুলের রক্তিম আভায় আগুনের মতো জ্বলে উঠত সেই স্থান– রক্তরাঙা পলাশী! অসম্ভব প্রতীকী একটি নাম। ইতিহাসের হাজারো ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ইতিহাস আমার খুব প্রিয় বিষয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, লর্ড ক্লাইভ, আলিবর্দী খাঁ, বাংলা-বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা, মীরজাফর, ঘসেটিবেগম, মীরমদন, মোহনলাল, জগৎশেঠ এমনি কত নাম! নায়ক-খলনায়কেরা একে একে ভেসে চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে দেখা দিতে থাকল। সেই আম্রকানন, যেখানে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যটা তার শেষ লাল আভা ছড়িয়ে অস্ত গিয়েছিল ১৭৫৭ সালে মীরজাফরের শঠতায়। আবার এই আমবাগান থেকে আর কিছুটা দূরে বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে, এই তো সেদিন ১৭ই এপ্রিল– শপথ গ্রহণ করেছে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। হঠাৎ করেই প্রাণ-মন নেচে উঠল। একটা আনন্দের শিহরন বয়ে গেল সমগ্র শরীরে-অন্তরে। গুঞ্জরণ তুলল রবীন্দ্রনাথের গানের কয়েকটি কলি :

ওই পোহাইল তিমির রাতি
পূর্ব গগনে দেখা দিল নব প্রভাত ছটা
জীবনে-যৌবনে হৃদয়ে-বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি ॥

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পৌঁছলাম বহরমপুরে। ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রথম রাজধানী শহর। বিপরীতমুখী দুটি স্রোতধারা আমার অন্তরে-বাইরে বয়ে চলেছে। হঠাৎ যেন মনে হল ঘাতক মহম্মদী বেগের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার চারপাশে। আমি যেন সিরাজ-উদ্-দৌলার শেষ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। আবার পরক্ষণেই শুনতে পাচ্ছি "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।"

সকাল হয়ে গেছে। ট্রেন থামতেই নামার জন্য লোকজনের হুড়োহুড়ি লেগে গেল। বাবা যথারীতি আগেই সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। একজন বড়

একজন ছোট হাত ধরাধরি করে থাকতে আর ট্রেন পুরোপুরি থামলে সবাইকে চটজলদি নেমে পড়তে। যদি কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। আমরা বাবার নির্দেশমতোই কাজ করলাম। একসাথেই নামতে পারলাম সবাই। ছোট কাকু স্টেশনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রায় পনেরো বছর পর দুই ভাই এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা। মাকে জড়িয়ে ধরে ছোট কাকু অঝোর ধারায় কাঁদছেন। মার তো কথাই নেই! প্রায় সন্তানতুল্য এই ছোট দেবরকে এতদিন পর কাছে পেয়ে হঠাৎ বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। মার এমন অবস্থা আমরা কখনো দেখিনি।

রেলস্টেশন থেকে রিকশায় ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ছোট কাকুর কোয়ার্টারে। সেখানে আমাদের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় বসেছিলেন আমার পিতামহী যাঁকে আমরা ছোটবেলায় ডাকতাম বড়মা। এ ছাড়া ছোট কাকিমা এবং কাজল-মিণ্টু আমার ছোট দুই খুড়তুতো ভাইবোন। আমরা যেতেই বিশাল পরিবারে এক হুলুস্থুল লেগে গেল। পারিবারিক মিলনের এমন করুণ-মধুর দৃশ্য খুবই বিরল ঘটনা। নিঃস্ব রিক্ত উদ্বাস্তু আমরা ১০ জন আশ্রয় নিয়েছি ছোট কাকুর শোবার ঘর বিশিষ্ট ছিমছাম সাজানো কোয়ার্টারে। তাঁর পরিবারেরও সদস্য সংখ্যা ৫ জন। কাকিমা আগে থেকেই লুচি, তরকারি, পায়েস বানিয়ে রেখেছিলেন। শ্রান্ত-কান্ত-অপরিছন্ন আমরা হাতমুখ ধুয়ে সবকিছুই খেয়ে সাবাড় করে ফেললাম। ছোট কাকু কোনো ফাঁকে বাইরে গিয়ে নিয়ে এসেছেন গরম গরম শিঙাড়া আর কচুরি। আমাদের পেটে রাক্ষসের খিদে। মুহূর্তে তাও শেষ হয়ে গেল। কাকিমা বোধ হয় একটু অস্বস্তিতেই পড়লেন বাঙালদের এমন রাক্ষুসে খাওয়া দেখে।

বড়মা এ-যাত্রা উদ্ধার করলেন কাকিমাকে। তিনি আগেই কোনো ফাঁকে তাঁর পুজোর ঘর থেকে প্রসাদ হিসেবে নানারকম ফলমূল, চাল-কলা, সাগু-নারকেল আর প্রচুর আম কেটে নিয়ে এসেছেন। আমরা এত তৃপ্তি করে কতদিন যে খাইনি! তখন আমের সময়। মুর্শিদাবাদের আমের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কাকিমার মুখের অস্বস্তির কালো ছায়া সরে গিয়ে হাসি ফুটল। ছোট কাকু ঠাট্টা করে কাকিমাকে বললেন, "চা-কফি মাথা গুনে দিলেই চলবে।" আমি কাপড় বদলে কাকিমাকে সাহায্য করতে বসলাম। কাকিমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের পেট ভরেছে তো ঠিক মতো? কী লজ্জাটাই পেলাম বল! সব শেষ হয়ে গেল!" আমি কাকিমাকে বললাম, "আরে শেষ হয়েছে কি তুমি কম আয়োজন

করেছ বলে নাকি? স্বাভাবিক অবস্থায় এমন রাক্ষসের মতো কেউ খায়? তোমার রান্না এত মজা যে আমরা কেউই একটুও ছাড় দিইনি। যতটা সম্ভব টাইট করে উদরপূর্তি করেছি এত মজার খাবার একটুও যদি মিস হয়ে যায় সেই ভয়ে।" কাকিমা বললেন, "সত্যি বলছিস?" মা কিছুক্ষণ আগেই এসে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন 'ঠিকই বলেছে বুলবুল। এত মজা করে কতদিন পর যে খেলাম! তোমার রান্নার হাত সত্যিই চমৎকার। এত বেশি খেয়েছি যে এখন অস্বস্তি হচ্ছে।' এবার কাকিমা বোধ হয় সত্যি সত্যি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। চা-কফি, গল্পগুজব চলছে। ভীষণ জোরে জোরে কথা বলছে সবাই। সকলের ভেতরেই দুঃখ-বেদনা, খুশি আনন্দের উত্তেজনা। বড়মা এসে সবাইকে তাগাদা দিলেন একজন একজন করে স্নানঘরে গিয়ে স্নান সেরে আসতে। আমার খুড়তুতো বোন কাজল আমার কানে-কানে এসে বলল, "দিদি আমাদের বাড়ির পেছনেই কিন্তু গঙ্গা নদী, এখন কোমরজল। ওখানে যাবে স্নান করতে?" আমি তো লাফিয়ে উঠলাম। মা ছাড়া সবাই মিলে চলে গেলাম নদীতে স্নান করতে। যদিও সাঁতার জানি না, কিন্তু গ্রীষ্মকালে নদীর গভীরতা কম। তা ছাড়া এটা তো গঙ্গার একটা শাখা! হৈহুল্লোড় হুটোপুটি করে গঙ্গার ঘোলা জল একেবারে কাদাময় করে তুললাম।

এখন আর আমাদের মধ্যে ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। কোমরজল গঙ্গায় বহুক্ষণ ধরে হুটোপুটি করে বাসায় যখন ফিরলাম, বড়রা তখন আরেক প্রস্থ চা খাচ্ছে। কাকিমা আর মা রান্নাঘরে দুপুরের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত। নিরামিষ রান্না করছেন বড়মা, তাঁর হাতের রান্না শুনেছি চমৎকার। অবশ্য গন্ধেই তা বোঝা যাচ্ছিল! মগজের মধ্যে খিদের ভাবটা চনমন করে উঠল।

দুপুরে খেতে বসে দেখি এলাহি কাণ্ড। কাকিমার হাতের মাছ-মাংস আর বড়মার রান্না করা নিরামিষ, আমড়ার টক আর পায়েস! যেন অমৃতের স্বাদ!

খাওয়াদাওয়ার পর বড়মার নির্দেশে সকলকেই একটু বিশ্রাম নিতে হল। বড়মা অত্যন্ত স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ। দুপুরে খাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম আর রাতে খাওয়ার পর হাঁটা। পরিবারের সকলকেই এই নিয়ম মেনে চলতে হয়। আমাদেরও খুব ঘুম পাচ্ছিল, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম। ঘুম থেকে যখন উঠলাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। কাজল (আমার খুড়তুতো বোন) চলে গেছে গানের স্কুলে আর মিণ্টু তার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে খেলতে।

রাতের বেলা আমাদের দুজনের অর্থাৎ লালাবাবু আর আমার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কাকুদের পাশের বাড়ি মুখার্জী বাবুদের ওখানে। বিস্ময়ে আমরা অভিভূত

হয়ে গেলাম। জানা নেই, পরিচয় নেই, আত্মীয়তা নেই, বিদেশ-বিভুঁই-এ নতুন বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর জন্য তাঁদের নিজেদের শোবার ঘর ছেড়ে দিয়েছেন মুখার্জীবাবুর স্ত্রী। তিনিই বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করেছেন এই ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য। যতদিন বহরমপুর থাকব ততদিন এই ব্যবস্থাই চালূ থাকবে।

পরদিন সকালে প্রচণ্ড হইচই আর শ্লোগানের আওয়াজ শুনে হঠাৎ করে চমকে উঠলাম। এখানে আবার এসব কেন! সামনের রাস্তা দিয়ে বিশাল বিশাল দুটো খাঁচার মতো গাড়ি তার ভেতর থেকে সমস্বরে আওয়াজ আসছে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। বাংলাদেশে থাকতেই এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। শুনেছিলাম এটা চারু মজুমদারের নক্সালপন্থীদের শ্লোগান। কিন্তু এই ১৫/১৬ বছরের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা রাজবন্দি! নিজের জীবনের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, কী প্রচণ্ড তারুণ্যে উদ্দীপ্ত ছেলেরা! শ্লোগান দিচ্ছে সমাজের সব বাসি–পচা ধ্যান-ধারণাকে বদলে দিয়ে নতুন সমাজ গড়ার। কিন্তু ওরা নিজেরা কি জানে শুধু শ্লোগান দিয়ে জেলে বন্দি হয়ে কালাতিপাত করলে সমাজ বদলে যায় না! আমরাও শ্লোগান দিয়েছি, 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা' 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না' 'আসাদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না' 'জয় বাংলা'। আমরাও এই বয়সেই রাস্তায় নেমেছি প্ল্যাকার্ড ব্যানার হাতে নেতাদের পেছন পেছন, বুঝে-না বুঝে তাঁরা যা করতে বলেছেন তা-ই করেছি। পুলিশের পিটুনি খেয়েছি, টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় চোখের জ্বলুনিতে কষ্ট পেয়েছি তবু আবার নতুন উদ্যামে আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। কিন্তু আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যটা স্থির হয়ে গিয়েছিল একটি বিন্দুতে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বাঙালি সংস্কৃতি, অর্থনীতি, মেধা ও মননকে চিরতরে ধ্বংস করার চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসার অনিবার্য অনিরুদ্ধ পথ– বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

ওদের এই 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির সঙ্গে আমাদের মিল কতটুকু? অমিলই-বা কোথায়, ভেবেছি–উত্তর পাইনি। ততটা জ্ঞান বা বুদ্ধি কোনোটাই আমার ছিল না। কিন্তু আমার বয়সী কিংবা আরো দুতিন বছরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সব ছেড়ে দিয়ে এই বন্দি জীবনের কথা ভেবে কষ্টও পেয়েছি, তাদের মত ও পথ কোনোটাই মেনে নিতে পারিনি মন থেকে। কেন জানি মনে হয়েছে ওরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে অথবা আসলে কোনো লক্ষই নেই, শুধুই উন্মাদনা। আমার ছোটকাকু কংগ্রেস দলের সমর্থক। আমরা বামপন্থী ঘরানার।

তাই মাঝে মাঝে বেশ উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়ে যায় রাজনীতির আলোচনায়। আবার বেশি জোর গলায় কিছু বলতেও পারিনা কারণ কংগ্রেস সরকারের দয়াতেই প্রায় দেড় কোটি বাঙালি নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে, ট্রামে-ট্রেনে-বাসে বিনে পয়সায় চড়তে পারছে! নক্সাল আন্দোলনকে আমি মন থেকে সমর্থন না করলেও এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের জন্য খুব মায়া লাগে। ছোট কাকু দুচক্ষে দেখতে পারে না নক্সালপন্থীদের। বাচ্চা ছেলেগুলোর ওপর আরো বেশি রাগ! লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি করার জন্য তাদের প্রতিও কোনো সহমর্মিতা নেই। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ দুচারটে কথায় বোঝা যায় এই কিশোর-তরুণ ছেলেগুলোর ওপর পুলিশি অত্যাচারের বিষয়টা তিনি মেনে নিতে পারেন না। জেলখানা থেকে মন খারাপ নিয়ে ফিরলেই আমরা বুঝতে পারি সেদিন কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সময় পেলেই কাকু আমাদের ঘুরিয়ে দেখান বহরমপুর শহর। কাকুদের কোয়ার্টার বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের খুবই কাছে। কোর্ট-কাছারি, হাসপাতাল এ সবই ব্রিটিশ আমলে গড়ে উঠেছে সেনানিবাসকে ঘিরে। বড় বড় গাছপালায় ছাওয়া অপূর্ব সুন্দর স্নিগ্ধ পরিবেশ। সগর বংশ উদ্ধারের জন্য রাজা ভগীরথ এই পথেই গঙ্গাকে এনেছিলেন তাই গঙ্গার নাম এইখানে ভাগীরথী। কতকিছু যে দেখার আছে এখানে! নবাবি আমল এবং ব্রিটিশ আমলের অসাধারণ ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্র। বড় ইমামবাড়া, মদিনা মসজিদ, আদিনাথের মন্দির, ১১৪ ঘর এবং এক হাজার দরজা বিশিষ্ট হাজার দুয়ারী, মীরজাফরের নামে একদার জাফরাগঞ্জের প্রাসাদকে অনেকেই বলে নিমকহারাম দেউড়ি, রয়েছে মিরনের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ যেখানে মোহাম্মদী বেগের হাতে খুন হয়েছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ। রয়েছে মোতিঝিল যা এখন প্রায় ডোবা-পুকুরের রূপ নিয়েছে তার পাড়ে সিরাজ-উদ-দৌলার ফুফু ঘসেটি বেগম অর্থাৎ নবাব আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা মেহেরুন্নিসার প্রাসাদের জরাজীর্ণ উপস্থিতি। আরো যে কতশত কারুকার্যময় দালান-কোঠা মন্দির মসজিদ সমাধিস্থল রয়েছে ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে!

পনেরো-ষোলো দিন বহরমপুরে থেকে আমরা চলে গেলাম মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার মানা নামক স্থানে। আমার ছোট ভাশুর সুজিত লালা আছেন সেখানে। বছর তিনেকের মেয়ে ঝুমনকে নিয়ে তাঁদের ছোট্ট সংসার। দণ্ডকারণ্যের কিছুটা অংশ পরিষ্কার করে গড়ে তোলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন সময়ে চলে যাওয়া অভিবাসীদের আবাসস্থল। তাদেরকে দেয়া হয়েছে কিছু জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি যা তারা নিজেদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী পরিষ্কার করে চাষাবাদ করবে, গড়ে তুলবে একটি উপশহর। আমার ছোট ভাশুর সেখানকার প্রকৌশল দপ্তরে কর্মরত আছেন। বেশ ছিমছাম একটি উপশহর। দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, বিদ্যুৎ সিনেমা হল সবই আছে, কিন্তু কোলাহল নেই। মেয়েরা সাইকেলে চড়ে বাজার-হাট, স্কুল-কলেজ সবই করে। সন্ধ্যার পর বেশ একটু ঝিমিয়ে পড়ে। সকাল হলেই জেগে ওঠে।

রামায়ণের আমল থেকেই দণ্ডকারণ্যের নাম সুপরিচিত। রাম লক্ষ্মণ, সীতা বনবাসে থাকাকালীন সময়ে দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করে এবং এখান থেকেই রাবণ ছল করে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় শ্রীলঙ্কায়। খাওয়াদাওয়া আর রেডিও শোনা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আমার জা রান্নাবান্না আর মেয়েকে সামলাতেই ব্যস্ত থাকেন সারাদিন। মাঝেমধ্যে আমাকে নিয়ে এর-ওর বাসায় বেড়াতে যান। সকলেই বাংলাদেশের কথা শুনতে চান। এখানকার বাঙালিরা সবাই মূলত বাংলাদেশী মানুষ। কিছু পরিবার আছে যাদের বাবা-মা সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পরপরই চলে এসেছিলেন। তারা হয়তো ছোট ছিল

যে-কারণে বাংলাদেশের কথা তাদের খুব একটা মনেও নেই, দেশের প্রতি বিশেষ টানও নেই, এমনি একটি পরিবারে একদিন বেড়াতে গেছি। ভদ্রমহিলার বয়স পঁচিশ-তিরিশ হবে অর্থাৎ আমার থেকে বেশ কয়েক বছরের বড়। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা ভারতে শরণার্থী যারা এসেছে তারা কি বাঙালি না মুসলমান?" আমি ওঁর এই অদ্ভুত প্রশ্নে খুবই রেগে গেলাম। তখন কেন জানি খুব সামান্য কারণেই রেগে যেতাম। আমি বেশ একটু রূঢ়ভাবেই জবাব দিলাম, "বাঙালি না মুসলমান মানে কী? সবাই বাঙালি! মুসলমানও আছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানও আছে। মুসলমানরা কি বাঙালি হয় না নাকি?" ভদ্রমহিলা আমার এই কড়া জবাবে একটু হকচকিয়ে গেলেন। বোধহয় একটু রুষ্টও হলেন আমার ওপর। মনে-মনে হয়তো ভাবলেন-শরণার্থীর আবার এত চোটপাট! তবে আমার জা যে একটু অপ্রস্তুত হলেন তা বুঝলাম তাঁর চেহারা দেখেই। আমি নিজেও মনে-মনে একটু অনুতপ্ত হলাম। হাজার-হোক অন্যের দেশে অন্যের দয়ার ওপর বেঁচে আছি। কথায় বার্তায় একটু বিনীত ও সংযমী হওয়া উচিত। কিন্তু ওই যে কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে! অন্যায়, অনুচিত কথা শুনলে পালটা জবাব না দিয়ে হজম করতে পারি না।

একদিন রাতের বেলা বিছানায় শুতে গিয়ে বালিশের ওপর বিশাল বড় একটা কাঁকড়াবিছা। আমি ভয়ের চোটে দিয়েছি প্রচণ্ড এক চিৎকার। লালাবাবুও আমার প্রায় পেছন পেছনই এসেছিল। সেও দেখেছে। আমার চিৎকার শুনে আমার ভাশুর এবং জা দুজনেই ছুটে এসেছেন পাশের ঘর থেকে। কাঁকড়াবিছাটা ততক্ষণে বালিশ ছেড়ে বিছানার মধ্যখানে এসে আরাম করে বসেছে। আমার ভাশুর দ্রুত দৌড়ে গিয়ে একটা শলার ঝাড়ু আর কিছু কাগজ আর দেশলাই নিয়ে এসেছেন। মেঝের মধ্যে কাগজ রেখে তাতে আগুন জ্বেলে শলার ঝাড়ু দিয়ে কাঁকড়াবিছাটাকে জোরে জোরে পিটিয়ে একটু কাবু করে, তারপর ঝাড়ু দিয়েই ফেলে দিলেন জ্বলন্ত কাগজের ওপর। কাঁকড়াবিছার দাহ সম্পন্ন হল। উনি সমস্ত বিছানা, চাদর-তোশক-বালিশ উলটেপালটে দেখলেন, খাটের তলা পায়া হাতল কিছুই বাদ দিলেন না। তারপর বললেন "ভাগ্যিস তুমি দেখেছিলে! কাঁকড়াবিছা খুবই বিষাক্ত। কামড়ালে মানুষ বাঁচে না। আর কী বিশাল সাইজের বাব্বাহ্।" ওঁরা চলে গেলেন, আমরা ভয়ে সারারাত লাইট জ্বালিয়ে বসে থাকলাম। ঘুম হল না।

বহরমপুর থেকে আসার সময় ছোট কাকু আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলেন। এত দূরে যাচ্ছি হঠাৎ কখন বিপদ-আপদ হয়! টাকাটা খরচ

হয়নি। দরকারও পড়েনি। মানায় আসার পর আমার জা, আমি ডাকি ছোড়দি, তিনিও আশীর্বাদ করে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন। আমি তখন বেশ বড়লোক। একশো টাকার মালিক! একদিন খুব ইচ্ছে হল মিষ্টি খেতে। আমি সন্দেশ খেতে পছন্দ করি। বাড়ির কাছেই আছে একটা মিষ্টির দোকান। ভাবলাম সাবার জন্য কিছু মিষ্টি নিয়ে আসি। আমি দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সন্দেশ হ্যায়?" মিষ্টিবিক্রেতা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল "কেয়া?" আমি আবারও বললাম, "সন্দেশ মাংতা, সন্দেশ হ্যায়?" লোকটা রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "কেয়া বোলতা? সান্দাশ! কাঁহা হ্যায় সান্দাশ? ভাগো, ভাগো ইঁহাসে।" রাগে-দুঃখে অপমানে আমি চলে এলাম সেখান থেকে। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছিল। নিশ্চয়ই চেহারা আর হিন্দি উচ্চারণে বুঝতে পেরেছে আমি 'জয় বাংলা'র লোক আর পয়সা ছাড়াই সন্দেশ খেতে চাচ্ছি। বাসায় ফিরে এলাম। মন খারাপ দেখে আমার ভাশুর জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে, দেশের জন্য মন খারাপ লাগছে? এইখানে থাকতে অসুবিধা হচ্ছে?" আরো কত কী তিনি বললেন। তারপর বললেন, "আরে দাঁড়াও না, কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।" আমি মিষ্টির দোকানের ঘটনাটা ওঁকে বললাম। উনি একটু হেসে বললেন, "ঘটনাটা খুলে বলো তো, তুমি এক্সাক্টলি কী জিজ্ঞেস করেছিলে?" আমি পুরো ঘটনাটাই বললাম। উনি বেশ জোরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, "আসলে ওরা সন্দেশকে বলে কালাকাঁদ। আর সন্দেশের কাছাকাছি এখানে একটা শব্দ প্রচলিত আছে সান্দাশ। যার মানে হল বিষ্ঠা।" এইবার দোকানির রাগের কারণ বুঝতে পেরে হাসি পেয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দাদাই গিয়ে আমার জন্য সন্দেশ কিনে আনলেন।

দশ-বারো দিন মানায় থেকে ফিরে এলাম কাঁচরাপাড়া। বহরমপুর ছেড়ে আসার সময় কাকু এবং বাবার কাছে আমার ভাশুরের ঠিকানা দিয়ে এসেছিল লালাবাবু। কাকুই চিঠিতে জানিয়েছিলেন বাবা-মা এবং ভাইবোনেরা সবাই কাঁচরাপাড়ায় গেছে। সেখানকার ঠিকানা এবং রেলপথে কীভাবে যেতে হবে তাও জানিয়েছেন কাকু। বাবার চিঠিও এসেছে একদিন দুদিন পরই। ভারতের ডাকব্যবস্থা খুব ভালো। তা ছাড়া এখানে সবারই চিঠি লেখার অভ্যেস আছে। আমরাও চিঠিতে জানিয়ে দিলাম যে আমরাও কাঁচরাপাড়ায় আসছি। সেখানে গিয়ে দেখি সবাই আমার সেজ মামার বাসায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আমার দুই মাসি এবং আরেক মামাও থাকেন কাঁচরাপাড়ায়। মেজমামাও থাকেন শিয়ালদা

যেতে কাঁচরাপাড়ার পরের স্টেশন হালি শহরে। কাজেই ভাইবোনদের আনাগোনা হৈহুল্লোড়ে সারাক্ষণ মেতে আছে সবাই। আমার বাবা আমার মামা-মাসির খুবই প্রিয় মানুষ। মার ছোট ভাইবোনেরা জামাইবাবু বলতে অজ্ঞান। বাবা অত্যন্ত মজলিশি মানুষ।

কিছুদিন পর মামা-মাসিরা মিলে রেলওয়ে কোয়ার্টারে একটা ঘরে আমাদের সবার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ছোট্ট আট ফুট বাই দশ ফুটের একটা ঘরে আমরা দশ জন মানুষ। সামনের ছোট বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা। বালতির মতো আকারের কয়লার চুলো। এখানে সবারই কয়লার চুলোতে রান্নার অভ্যেস আছে। মা প্রথম প্রথম চুলো ধরাতে হিমশিম খেয়ে যেতেন। দু-চার দিনের ভেতর আয়ত্তে এসে গেল।

সমস্যা হল টয়লেট নিয়ে। বেশ খানিকটা দূরে সার বেঁধে কমন টয়লেট। কিন্তু উপায় কী! মার ছোটবোন জয়ন্তী মাসির স্বামী হারু মেসো একজন অসাধারণ মানুষ। তিনিই সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, একটা কাঠের চৌকি, বিছানা-বালিশ কিনে দিয়েছেন। আনাজপাতি, চাল-ডাল-তেল-মশলা মামামাসিরা মিলেঝুলে পাঠিয়ে দেন। শাড়ি-ব্লাউজ, কাপড়চোপড় সবই কিনে দিয়েছেন সবার জন্য।

আমার ছোট বোনটি মাঝে মাঝে বায়না ধরে পাউরুটি, মাখন, পরোটা, পোলাও-মাংস খাবার জন্য। আমরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে থামাই।

কাঁচরাপাড়ায় সবাইকে রেখে, বাবা আড়াইশ টাকা বেতনের একটা চাকুরি নিয়ে চলে গেলেন কুচবিহার। ছোট কাকুই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিছুদিন পর কাকুও ফিরে গেলেন আগরতলা। জীবনের তাগিদে এই বিচ্ছিন্নতা সকলেই মেনে নিয়েছি। আমার মামা-মাসিরা কাঁচরাপাড়ায় থাকে বলে আমাদের খাওয়াদাওয়া থাকার তেমন মারাত্মক অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু কতদিন এভাবে চলবে! এই অনিশ্চিত জীবনের কোথায় পরিসমাপ্তি? স্বাধীনতা কবে আসবে? বাংলাদেশ কি আরেকটি ভিয়েতনাম হতে যাচ্ছে? মাঝে মাঝে বিষণ্ণতা এমনভাবে গ্রাস করতে থাকে!

বাবা কুচবিহারে পৌছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। তারপর প্রায় দুমাস পর একটি চিঠি এসেছে। তার সঙ্গে দুশো টাকার একটি মনিঅর্ডার । টাকাটা হাতে পেয়ে মার দুই চোখ দিয়ে গড়গড় করে জল নেমে এল। এতদিন মুখে কিছু না বললেও, অন্যের ওপর বোঝা হয়ে থাকার গ্লানি যে কী ভীষণভাবে কাজ

করছিল এই চোখের জলই তা বলে দিল। বাজার থেকে প্যারা সন্দেশ আনিয়ে জয়ন্তী মাসির বাসার লক্ষ্মীর আসনের কাছে রেখে সন্ধ্যায় তা সবার মধ্যে বিতরণ করলেন। মা পূজা-আর্চায় খুব বিশ্বাসী নন। কিন্তু মনে হল কোনো-এক অদৃশ্য শুভশক্তির আশীর্বাদকেই যেন তিনি কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করলেন।

বাবা লিখছেন তিনি ভালোই আছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। ওরা মাঝে মাঝে টাকাপয়সা, ওষুধপত্র, জামাকাপড় এবং খাবার-দাবার নিয়ে যায়। এসব সংগ্রহ করার কাজে বাবা ওদের সাধ্যমত সাহায্য করেন। যাক, একটা বিষয়ে অন্তত নিশ্চিত হওয়া গেল মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটা কাজ পেয়েছেন বাবা। তা না হলে বাবার যেমন প্রকৃতি তাতে হয়তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে, কাউকে না বলে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রেই চলে যেতেন। অবশ্য, এখনো তার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। দিন বিশেক পরে আরেকটা চিঠি এল। তাতে লিখেছেন সপ্তাহের ছুটির দিনগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে চেংড়াবান্ধা, শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ির শরণার্থী ত্রাণশিবির আর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ঘুরে এসেছেন। এরপর প্রতি সপ্তাহেই যাবেন প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, খাবারদাবার ইত্যাদি নিয়ে। মিঃ বসু বলে এক ভদ্রলোকও আছেন বাবার সঙ্গে।

চট্টগ্রামের বিখ্যাত আইনজীবী প্রয়াত কৃষ্ণপ্রসাদ নন্দী আমার মেসোশ্বশুর। দমদমে বাড়ি করেছিলেন। আজ সেখানেই যাওয়ার কথা। কাঁচরাপাড়া থেকে বারো-তেরোটা স্টেশন পরেই দমদম। যেতে দেড়ঘণ্টামতো সময় লাগে। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর রওনা দেব ঠিক করেছি। সে-রাতে দমদমেই থাকার কথা। লালাবাবু আগে দুএকবার গেছে, আমি এই প্রথমবার যাচ্ছি। রেলস্টেশনে এসে দেখি কী এক অজ্ঞাত কারণে ট্রেন চলছে না। তিন-চার ঘণ্টা পরে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। তখন মাঝেমধ্যেই এই ধরনের ঘটনা ঘটত।

নক্সাল আন্দোলন তখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। কংগ্রেস সরকার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এদের সামাল দিতে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তারা জেলের অন্ধকার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। নক্সাল নেতা চারু মজুমদারের ছবি দেখে অবাক হয়ে ভেবেছি–'এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়!' আমি ভাবতাম, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আন্দোলন, জীবনদান তো স্বাধীনতার জন্য, এদের লক্ষ্য কী? কেন এরা বাস পোড়ায়, ট্রাম জ্বালায়, রেললাইন তুলে ফেলে, মানুষ খুন করে, নিজেরাও খুন হয়ে যায় আবার হাসতে হাসতে জেলেও ঢোকে! তাদের 'ইকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি শুনে মনে হতো তারা যেন অলিম্পিক মেডেল জয় করে ফিরেছে। কতই বা তাদের বয়স, আমাদেরই বয়সী বেশির ভাগ। চোদ্দ তেকে সতেরো-আঠারো ! আমার সবসময়ই মনে হতো এরা ভুল পথে আন্দোলন করছে। নেতা-কর্মীরা এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের ধ্বংসের রাজনীতির পথে টেনে নিয়ে এসে আন্দোলনের কার্যকর দিকটাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। সাধারণ জনতার কাছ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে

যাচ্ছে। এত ভাঙচুর, এত অরাজকতা, এত অশান্তি রাজনীতি-বহির্ভূত সাধারণ মানুষের সমর্থন পায় না। এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো শুধু নেতাদের হুকুম তামিল করে এবং অধিকাংশ সময়ই জোশের কারণে, কষ্ট হয় কিন্তু ওদের কার্যকলাপকে সমর্থনও করতে পারি না। কখনো কখনো নিরীহ, নিরপরাধ ছেলেরাও ধরা পড়ে যায়-যার প্রচণ্ড রকম নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনে। অবশ্য এগুলো সবই আমার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা!

মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খেতে, ভিড় দেখতে দেখতে, অপেক্ষা করতে করতে, বিকেল প্রায় ছয়টা নাগাদ ট্রেন এল। হুড়মুড় করে সব যাত্রী ঢুকতে থাকল ট্রেনের কামরায়। আমরা ঠিক ততটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি। কাজেই মানুষের ঠেলাঠেলিতে আমরা দুজন ছিটকে পড়লাম। প্রায় সবাই উঠে পড়ল ট্রেনে। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম প্ল্যাটফর্মে। ট্রেন আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। ধূতি আর শার্টপরা অত্যন্ত সৌম্য চেহারার একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, "আপনারা কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?" আমরা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। তিনি আবার বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আপনারা কোথায় যাবেন?' লালাবাবু বলল 'দমদম'। একটি বিশ-বাইশ বছর বয়সী ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে, এগিয়ে এল। সেও বোধহয় এতক্ষণ ট্রেনে ওঠা নিয়ে আমাদের নাস্তানাবুদ হওয়ার দৃশ্য দেখছিল। বলল, আধঘণ্টার মধ্যেই আরেকটা ট্রেন এসে পড়বে, আমি উঠিয়ে দেব আপনাদের, চিন্তা করবেন না। বয়স্ক ভদ্রলোকটি বললেন "সেই ভালো।" ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন, ছেলেটি বলল, "সন্ধ্যায় আপনার বাড়িতে আসব মাষ্টারমশায়।" ভদ্রলোক মাথা কাত করে সম্মতি জানালেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই আরেকটি ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল। ছেলেটি বলল, "এগিয়ে আসুন, আমাকে ধরে থাকবেন। থামার সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে পড়বেন ট্রেনে। অন্য কাউকে ধাক্কা দেয়ার সুযোগ দেবেন না। নিজেরাই ধাক্কা দিয়ে পাশের লোকদের ঠেলে দেবেন। এতে লজ্জার কিছু নেই। এটাই এখানকার এখনকার দস্তুর।" বিশাল লম্বা লেকচার দিয়ে ছেলেটা সত্যিই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ট্রেনে উঠিয়ে দিল। তারপর অতি ক্ষিপ্রগতিতে দুটো সিট দখল করে আমাদের বসিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ভিড় ঠেলে সেই চলন্ত ট্রেন থেকেই লাফিয়ে নেমে গেল ছেলেটা। ওর বেপরোয়া চালচলন দেখে মনে-মনে ভাবলাম, ছেলেটা কি নক্সালপন্থী!

প্রায় আটটার দিকে আমরা মাসিমার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। সারা বাড়িতে একটা হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল। বড় মাসিমা, তাঁর বড় ছেলে আমার ভাশুর হারুদা, জা রীতাদি দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন আর দেবর টুলু, হারুদার দুই ছেলেমেয়ে বুয়া ও সুমি নিচে নেমে এসেছে। রীতাদির হাতে কাঁসার থালায় প্রদীপ, ধানদূর্বা, সিঁদুর, চন্দন, ফুল-বেলপাতা ইত্যাদি–রীতিমতো বধূবরণ। আবেগে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। টুলুর কথা লালাবাবুর কাছে শুনেছিলাম। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সমানে কলকল করে চলেছে।

রীতাদি থালা ঘুরিয়ে আগুন ছুঁইয়ে সিঁদুর পরালেন, তারপর ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মাসিমা ও হারুদাও ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমি বড়দের সবাইকে প্রণাম করলাম। মাসিমা আমাকে খুব সুন্দর একটা মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি দিলেন। সবকিছু দেখেশুনে আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগল। হাজার হোক শ্বশুরবাড়ির লোকজন, ভাশুর-জা-শাশুড়ির সামনে কেমন সঙ্কোচ হতে লাগল। কিন্তু এক নিমেষেই হারুদা সম্পূর্ণ পরিবেশ হালকা করে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার শ্বশুর বাড়ি নয়, নিজের বাড়ি। এখানে তোমাকে মাথায় ঘোমটাও দিতে হবে না, সাবধানে বুঝে–শুনেও চলতে হবে না।" টুলুদা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ব্যস্ হয়ে গেল, সম্পূর্ণ স্বাধীন! তা হলে এখন থেকে শুরু হোক। তুমি ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, আমি মোহনবাগানের! আমি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলাম না, তুমি ইস্টবেঙ্গল আমি মোহনবাগান। আমি তো চুনী গোস্বামীর ফ্যান। আমাদের বাসায় সবাই ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, শুধু আমি মোহনবাগানের। টুলুদা লালাবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, "ও বাবাঃ! বাবুল দা, তোমার বউ তো বড় ঠ্যাঁটা আছে। সে মোহনবাগানকেই সাপোর্ট করবে! আবার বলে কি না চুনী গোস্বামীর ফ্যান! তোমার তো দেখছি বেশ করুণ অবস্থা।" সবাই আমাদের কথা শুনে হাসাহাসি করতে লাগল।

আবার মেজো ননাস দোলনচাঁপা সেন, আমরা ডাকি টুনুদি। তিনিও এসেছিলেন। এত দেরি দেখে ফিরে গেছেন সোনারপুরে। সেখানেই তিনি থাকেন। রীতাদি আমার হাতে একটা শাড়ির প্যাকেট আর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললেন, "দোলনদি তোমার জন্য দিয়ে গেছেন। এই আধঘণ্টা আগেই তিনি গেলেন।' টুনুদির সঙ্গে দেখা না হওয়ায় মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। এতদূর থেকে তিনি এলেন! আমি ব্যাগ থেকে দুটো ক্যাটবেরি চকলেটের বার বের করে বাচ্চাদের হাতে দিলাম। ওরা ভীষণ খুশি! একটুও অপেক্ষা না করেই প্যাকেট খুলে খাওয়া শুরু করল। আমার খুব ভালো লাগল এই খুশিটুকু ওদের দিতে পেরে। বাচ্চারা কত সামান্য জিনিসেই খুশি হয়!

এরপর শুরু হল খাওয়ার পালা। লুচি-পায়েস, পোলাও-মাংস, কোর্মা-কালিয়া, মিষ্টি, ফল, রীতিমতো অত্যাচার! খেতে খেতে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর আমি রীতাদির সমস্ত ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করে খাওয়া-পরবর্তী গোছানোতে হাত লাগলাম। খুব দ্রুত কাজ সারা হয়ে গেল। আমরা সবাই মিলে ড্রইংরুমে এসে বসলাম। প্রত্যেকেই বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব। সকলেই অনেক কাল আগেই দেশ ছেড়ে এসেছেন, কিন্তু নাড়ীর টান! কত তাঁদের প্রশ্ন, কী তাঁদের উৎকণ্ঠা, খুঁটিনাটি সবকিছু জানার কী আগ্রহ! বিশেষ করে শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধার মাত্রা দেখে আমি রীতিমতো বিস্মিত হলাম! এই বাড়ির সকলেই কংগ্রেস দলের সমর্থক। বাংলাদেশের সংঘটিত নৃশংস গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধ এবং শরণার্থীদের বিষয়ে ইন্দিরা গান্ধীর বর্তমান পদক্ষেপ এবং তাঁর সরকারের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত , মানবিক বা রাজনৈতিক যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা হোক না কেন তা যথাযথ এবং অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য বলে মনে করেন এই পরিবারের সকল সদস্য। দল হিসেবে নয়, কংগ্রেস সরকারের এবং ভারতে বর্তমান নেত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রশ্নাতীত। কিন্তু শেখ মুজিবকে তাঁরা প্রায় মহামানবের পর্যায়ে বসিয়েছে। টুলুদা বলল, "বাংলাদেশ যদি কখনো স্বাধীন হয়, তা হলে যেমন করেই হোক, শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখার জন্য, তাঁর পায়ের ধুলো নেয়ার জন্য বাংলাদেশে যাব।"

অবাক হয়ে ভাবলাম, এক কোটিরও বেশি শরণার্থী ভারতের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। সবকিছুর দাম বেড়েছে, কারণ অতিরিক্ত কর বসানো হয়েছে, ট্রামে-বাসে, রাস্তায়-ঘাটে মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে সাংঘাতিক রকম। ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখা হুমকির সম্মুখীন কারণ শরণার্থীদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে অনেক স্কুল-কলেজ ব্যবহৃত হচ্ছে, রোগ-বালাই বেড়েছে কিন্তু সমগ্র ভারতের মানুষ, বিশেষ করে ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কোনো অভিযোগ না করে, যেভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সহানুভূতির সঙ্গে তা সত্যিই বিস্ময়কর। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত নেই। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই ঋণ শোধ করা যায় না।

অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে সবাই শুতে গেলাম। আমার ঘুম আসছিল না। নতুন জায়গায় আমার ঘুম হয় না। তা ছাড়া টুনুদি এসে ফিরে গেলেন, আমাদের সঙ্গে দেখা হল না, এর জন্যও মনটা খুঁতখুঁত করছিল। ঠিক হল, আমরা পরদিন সকালে সোনারপুরে যাব টুনুদির সঙ্গে দেখা করতে।

টুনুদি সোনারপুর স্কুলের শিক্ষিকা। স্কুল এবং পুরো পাড়াতেই অত্যন্ত জনপ্রিয় তাঁর মধুর স্বভাব এবং ব্যবহারের জন্য। একমাত্র ছেলে টিটোকে নিয়ে থাকেন একঘরের একটা ভাড়া বাড়িতে। আমরা যখন সোনারপুর গিয়ে পৌঁছলাম তখন প্রায় দুপুর বারোটা। স্টেশন থেকে খুব বেশি দূরে নয় সোনারপুর গার্লস হাই স্কুল। হাঁটাপথেই পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেখানে। আমরা সেখানে গিয়ে দোলনচাঁপা সেন-এর কথা বলতেই এক ভদ্রমহিলা, সম্ভবত তিনিও একজন শিক্ষিকাই হবেন, বললেন, "কিছু মনে করবেন না, দোলনদি আপনাদের কী হন?" লালাবাবু বলল, "উনি আমার মেজো বোন।" ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড উত্তেজিত এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "ও, আপনারা বুঝি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?" আমরা হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ালাম। "আচ্ছা কী অবস্থা এখন বাংলাদেশের? শেখ মুজিবকে কি সত্যিই পাকিস্তানে ধরে নিয়ে গেছে? তাঁকে কি বাঁচিয়ে রেখেছে, না মেরে ফেলেছে?" তাঁর উৎকণ্ঠা দেখে সত্যিই কেমন মায়া লাগল। কিন্তু তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর তো আমরাও জানি না। লালাবাবু বলল, "আসলে আমরা ঢাকা থেকে বের হয়েছি তো প্রায় দুমাস আগে। এখনকার অবস্থা তো আমরাও জানি না। আর শেখ মুজিবের ব্যাপারে আপনারাও যতটুকু জানেন আমরাও ততটুকুই জানি। কারণ জানার সোর্স তো একই। রেডিও আর পত্রিকা।" অফিসে যিনি বসেছিলেন তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন টুনুদির কাছে। খবর পেয়েই টুনুদি হুড়মুড় করে এসে ঢুকলেন স্কুলের অফিসরুমে। প্রথমে জড়িয়ে ধরলেন ছোট ভাইকে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরেব্বাপ্‌রে। বাবুল তোমার বৌতো দেখছি অপুর সংসারের

শর্মিলা ঠাকুরের মতো দেখতে।" আমি এতক্ষণ আমার রূপসী ননাসের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। এবার লজ্জা পেয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এল "আপনি তো সুচিত্রা সেনের মতো।" তারপর তাঁকে প্রণাম করলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ঠিক আছে আমি তোমার প্রশংসা করব, তুমি আমার। আমরা সুচিত্রা-শর্মিলা মিলে এখন অনেক গল্প করব। তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি আমাদের হেডমিস্ট্রেস স্নেহদিকে বলে ছুটি নিয়ে আসি।"

আমরা এই ননাসের ছবি দেখেছি আমার শ্বশুরবাড়িতে। সুন্দরী এবং গুণী মহিলা হিসেবে তাঁর নামডাক আছে। কিন্তু তিনি যে এত সুন্দর তা ভাবতেই পারিনি। ছবিতে এতটা বোঝা যায় না। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি চলে এলেন অনেক খাতাভর্তি একটা ব্যাগ এবং নীল রঙের একটা ছাতা হাতে নিয়ে। লালাবাবু টুনুদির হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল। প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে টুনুদি দিয়ে দিলেন। রাস্তায় নেমেই তিনি বোতাম টিপে ছাতাটা খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এটা ধরো, অনেক রোদ, এমন টকটকে রংটা পুড়ে যাবে।" আমার কোনো ওজর-আপত্তি তিনি শুনলেন না। সুতরাং টুনুদি মাথায় কাপড় দিয়ে, আমি ছাতা মাথায় দিয়ে চলছি আর লালাবাবু খালি মাথায় ভ্রূ কুঁচকে পথ চলতে লাগল।

ভারতের মেয়েরা প্রচুর হাঁটতে পারে। তারা দিনের বেলায় রং-বেরঙের ছাতা হাতে নিয়ে পথ চলে। মেয়েরা সাইকেলও চালায়। শাড়ি পরেও চালায়। আগরতলায়, বহরমপুরে, মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে, দমদমে, কাঁচরাপাড়া এবং সোনারপুরে এসেও দেখলাম একই দৃশ্য। আমার প্রথম প্রথম অবাক লাগত। আমাদের দেশে মেয়েদের এরকম সাইকেল চালানোর চল নেই। তারা ছাতা মাথায় দিয়েও হাঁটে না। এখন চোখ সওয়া হয়ে গেছে। আরেকটা ব্যাপার আমার খুবই অবাক লাগত, মেয়েরা একা একা অনেক রাত পর্যন্ত ট্রামে-বাসে, রিক্সায় কিংবা হাটা পথে যাতায়াত করে, হাট-বাজার করে এবং সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে অভিভাবকদের সামনেই চুটিয়ে আড্ডা মারে।

রেললাইন পার হয়ে এবার চলে এলাম উলটোদিকের রাস্তায়। সামনেই একটা পুকুর, তাতে শান বাঁধানো ঘাট আর তারপরে একটা চারতলা বাড়ি। তারই পাশ দিয়ে চলে গেছে ইট ও খোয়া বিছানো রাস্তা। সেই পথ দিয়েই চলেছি আমরা। পুকুরওয়ালা বাড়িটা দেখে মন কেমন করে উঠল। শ্বশুরবাড়ির

টুনুদি সোনারপুর স্কুলের শিক্ষিকা। স্কুল এবং পুরো পাড়াতেই অত্যন্ত জনপ্রিয় তাঁর মধুর স্বভাব এবং ব্যবহারের জন্য। একমাত্র ছেলে টিটোকে নিয়ে থাকেন একঘরের একটা ভাড়া বাড়িতে। আমরা যখন সোনারপুর গিয়ে পৌঁছলাম তখন প্রায় দুপুর বারোটা। স্টেশন থেকে খুব বেশি দূরে নয় সোনারপুর গার্লস হাই স্কুল। হাঁটাপথেই পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেখানে। আমরা সেখানে গিয়ে দোলনচাঁপা সেন-এর কথা বলতেই এক ভদ্রমহিলা, সম্ভবত তিনিও একজন শিক্ষিকাই হবেন, বললেন, "কিছু মনে করবেন না, দোলনদি আপনাদের কী হন?" লালাবাবু বলল, "উনি আমার মেজো বোন।" ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড উত্তেজিত এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "ও, আপনারা বুঝি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?" আমরা হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ালাম। "আচ্ছা কী অবস্থা এখন বাংলাদেশের? শেখ মুজিবকে কি সত্যিই পাকিস্তানে ধরে নিয়ে গেছে? তাঁকে কি বাঁচিয়ে রেখেছে, না মেরে ফেলেছে?" তাঁর উৎকণ্ঠা দেখে সত্যিই কেমন মায়া লাগল। কিন্তু তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর তো আমরাও জানি না। লালাবাবু বলল, "আসলে আমরা ঢাকা থেকে বের হয়েছি তো প্রায় দুমাস আগে। এখনকার অবস্থা তো আমরাও জানি না। আর শেখ মুজিবের ব্যাপারে আপনারাও যতটুকু জানেন আমরাও ততটুকুই জানি। কারণ জানার সোর্স তো একই। রেডিও আর পত্রিকা।" অফিসে যিনি বসেছিলেন তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন টুনুদির কাছে। খবর পেয়েই টুনুদি হুড়মুড় করে এসে ঢুকলেন স্কুলের অফিসরুমে। প্রথমে জড়িয়ে ধরলেন ছোট ভাইকে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরেব্বাপ্‌রে। বাবুল তোমার বৌতো দেখছি অপুর সংসারের

শর্মিলা ঠাকুরের মতো দেখতে।" আমি এতক্ষণ আমার রূপসী ননাসের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। এবার লজ্জা পেয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এল "আপনি তো সুচিত্রা সেনের মতো।" তারপর তাঁকে প্রণাম করলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ঠিক আছে আমি তোমার প্রশংসা করব, তুমি আমার। আমরা সুচিত্রা-শর্মিলা মিলে এখন অনেক গল্প করব। তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি আমাদের হেডমিস্ট্রেস স্নেহদিকে বলে ছুটি নিয়ে আসি।"

আমরা এই ননাসের ছবি দেখেছি আমার শ্বশুরবাড়িতে। সুন্দরী এবং গুণী মহিলা হিসেবে তাঁর নামডাক আছে। কিন্তু তিনি যে এত সুন্দর তা ভাবতেই পারিনি। ছবিতে এতটা বোঝা যায় না। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি চলে এলেন অনেক খাতাভর্তি একটা ব্যাগ এবং নীল রঙের একটা ছাতা হাতে নিয়ে। লালাবাবু টুনুদির হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল। প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে টুনুদি দিয়ে দিলেন। রাস্তায় নেমেই তিনি বোতাম টিপে ছাতাটা খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এটা ধরো, অনেক রোদ, এমন টকটকে রংটা পুড়ে যাবে।" আমার কোনো ওজর-আপত্তি তিনি শুনলেন না। সুতরাং টুনুদি মাথায় কাপড় দিয়ে, আমি ছাতা মাথায় দিয়ে চলছি আর লালাবাবু খালি মাথায় ভ্রূ কুঁচকে পথ চলতে লাগল।

ভারতের মেয়েরা প্রচুর হাঁটতে পারে। তারা দিনের বেলায় রং-বেরঙের ছাতা হাতে নিয়ে পথ চলে। মেয়েরা সাইকেলও চালায়। শাড়ি পরেও চালায়। আগরতলায়, বহরমপুরে, মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে, দমদমে, কাঁচরাপাড়া এবং সোনারপুরে এসেও দেখলাম একই দৃশ্য। আমার প্রথম প্রথম অবাক লাগত। আমাদের দেশে মেয়েদের এরকম সাইকেল চালানোর চল নেই। তারা ছাতা মাথায় দিয়েও হাঁটে না। এখন চোখ সওয়া হয়ে গেছে। আরেকটা ব্যাপার আমার খুবই অবাক লাগত, মেয়েরা একা একা অনেক রাত পর্যন্ত ট্রামে-বাসে, রিক্সায় কিংবা হাটা পথে যাতায়াত করে, হাট-বাজার করে এবং সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে অভিভাবকদের সামনেই চুটিয়ে আড্ডা মারে।

রেললাইন পার হয়ে এবার চলে এলাম উলটোদিকের রাস্তায়। সামনেই একটা পুকুর, তাতে শান বাঁধানো ঘাট আর তারপরে একটা চারতলা বাড়ি। তারই পাশ দিয়ে চলে গেছে ইট ও খোয়া বিছানো রাস্তা। সেই পথ দিয়েই চলেছি আমরা। পুকুরওয়ালা বাড়িটা দেখে মন কেমন করে উঠল। শ্বশুরবাড়ির

কথা মনে পড়ে ভীষন কান্না পেয়ে গেল। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, আমার দুই ভাশুর, জায়েরা এবং তাঁদের সন্তানেরা কেমন আছে কে জানে। ওরা প্রত্যেকেই ছিল চট্টগ্রাম। লালাবাবুর ভাবান্তরও চোখে পড়ল।

টুনুদি কথা বলতে ভালোবাসেন নাকি ছোট ভাইকে পেয়ে তাঁর এত বছরের জমে-যাওয়া কথার বান ছুটেছে বুঝলাম না। কিছু প্রশ্ন, কিছু অভিযোগ, কিছু তথ্য আবার কিছু উপদেশও।

স্কুল থেকে টুনুদির বাসা খুব দূরে নয়। একেবারেই হাঁটা-পথ। সামনে ছোট্ট উঠানে একটা চাপকল। তারপর একটা বারান্দাসহ এক ঘরের আবাসগৃহ টুনুদির। ছিমছাম গোছানো ঘর। একাই থাকেন। ছেলে টিটো পড়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে। সেখানকার হোস্টেলেই থাকে। স্বামী নির্মল সেন কানুনগোপাড়া কলেজের অধ্যাপক। অত্যন্ত মেধাবী ও সুপুরুষ কিন্তু সংসারের প্রতি তেমন মনোযোগ নেই। টুনুদি রাগ করে চলে এসেছেন এখানে। প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে যান ছেলের কাছে। সারাদিন থেকে সন্ধ্যায় চলে আসেন। কখনো কখনো খুব ভোরে গিয়ে ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। ছেলের পছন্দমতো খাবারা রান্না করে খাইয়ে-দাইয়ে সন্ধ্যার আগে-আগে গিয়ে ছেলেকে আবার হোস্টেলে রেখে আসেন।

ঘরে এসেই টুনুদি ব্যস্ত হয়ে গেলেন রান্নার কাজে। ঝটপট রান্না করে ফেললেন ডিমের ঝোল, ডাল, আলুপোস্ত আর বেগুনভাজা। আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম কী অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সব কিছু তিনি করলেন। আমি মোটেই রান্না জানি না। ডালও সেদ্ধ হতে থাকল সেই সঙ্গে আলু আর ডিম। সেই ফাঁকে মশলা করে চাল ধুয়ে বেগুন কুটে রাখলেন। সব মিলিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না। বান্না শেষ করে দেড়টার মধ্যে আমাদের দুপুরের খাবার খেতে বসিয়ে দিলেন। খেতে বসে বারবার আফসোস করতে লাগলেন মাছ মাংস কিছু খাওয়ানো গেল না বলে। এরই মধ্যে পাশের বাড়ির একটা ছোট ছেলেকে ডেকে মিষ্টি আনিয়ে রেখে দিলেন। নতুন-বউ ঘরে এসেছে, মিষ্টি না খাওয়ালে তো চলেই না। আমি ওঁর সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলাম। শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায় আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে রইল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর টুনুদি জানতে চাইলেন দেশের খবর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সবকিছু। স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ইমোশনাল হয়ে গেলেন। বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকলেন, "আমি কী করতে পারি দেশের জন্য, কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

আমরা উঠি-উঠি করছি এমন সময় দুজন তরুণ বয়সী ছেলে এল টুনুদির সঙ্গে দেখা করতে। টুনুদি ওদের ভেতরে ডেকে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কথাবার্তা শুনেই বোঝা গেল পার্টির ছেলে। বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কিছুক্ষণ পর একটি ছেলে লালাবাবুকে বলল, "আপনাদের কি মনে হয়, কংগ্রেস সরকার আপনাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে তেমন কিছু সাহায্য করবে?' লালাবাবু বলল 'বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে বেসরকারি সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণে সরকারি সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে যার ফলে এই স্রোতের মতো ভেসে আসা সর্বস্ব-খোওয়া-যাওয়া শরণার্থীরা প্রাণে বেঁচে আছে। হঠাৎ করে এই এক-দেড় কোটি লোকের চাপ সহ্য করে, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, বিনে পয়সায় বাসে ট্রেনে যাতায়াতের ব্যবস্থা করাকে আপনারা সাহায্য বলবেন না?"

একটি ছেলে বলল, "আমরা সল্টলেক, রানাঘাট, কল্যাণীসহ বেশ কটা শরণার্থী শিবির ঘুরে এসেছি। অর্ধেক লোক তো ম্যালেরিয়া আর ডায়রিয়াতে মারা যাবে। মশার উৎপাত, ওষুধ নেই, বিশুদ্ধ জল নেই, ময়লা আবর্জনা এবং পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই, কী ভয়ঙ্কর অবস্থা আপনারা জানেন?" ওদের কথায় আমার বেশ রাগ হলো। একটু চড়া সুরেই বললাম, "আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন শরণার্থীরা কংগ্রেস সরকারের অভ্যাগত অতিথি। তাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার-দাবার, বিশুদ্ধ জল, ওষুধ-পত্র, বিছানা-মশারির ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা উচিত ছিল।' ছেলে দুটো আমার দিকে চমকে তাকাল। হয়তো বা টুনুদিও। এমন নরম-সরম চেহারার ষোল-সতেরো বছরের মেয়ের মুখ থেকে এমন ব্যাঁকা-ট্যারা কথা বোধ হয় তারা আশা করেনি। তাই হঠাৎ কোনো জবাব দিল না। আমি আবারও বললাম. "বোঝাই যাচ্ছে আপনারা কংগ্রেস রাজনীতির বিপক্ষ দল। আমরাও বাম রাজনীতিরই সমর্থক। কিন্তু অযৌক্তিক আকাশ-কুসুম চিন্তাভাবনা, আর বিপক্ষদলের আন্তরিকতা এবং সফলতাগুলো বেমালুম চেপে গিয়ে ব্যর্থতাগুলোকেই শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করা তো কোনো কাজের কথা নয়। এতে সমস্যার সমাধান তো হয়ই না বরং উলটোটাই হয়। পরিস্থিতিটা তো বুঝতে হবে!'

ছেলেগুলো এবার যেন একটু রুষ্ট হল আমার ওপর। একজন বলল, "'তা হলে কি বলতে চান, যেভাবে চলছে তা ঠিকই আছে? আপনাদের কি মনে হয় বরাভয় মুদ্রা দেখিয়ে ইন্দিরা সরকার আপনাদের স্বাধীন করে দেবে?" লালাবাবু

আবার মুখ খুলল, "দেখুন, এসব হিসাব-নিকাশ করার সময় তো এখনো হয়নি! আর তা ছাড়া আমরা তো শরণার্থী। পরের দয়ায় বেঁচে আছি। ইন্দিরা সরকারের খুঁত বের করা আমাদের কাজ নয়। শরণার্থীদের জন্য আপনাদের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, সহানুভূতি বুঝতে পারছি, কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের অভিযোগ করা খুব অন্যায় হবে।"

টুনুদি এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি। এবার বললেন, "থাক, এসব তর্ক এখন থাক। এটা অত্যন্ত সেনসিটিভ ইস্যু। আর এর হিসেব-নিকেশ গুলোও দুয়ে দুয়ে চারের মতো এত সরল নয়। যার যার অবস্থানে থেকেই সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে।" ছেলে দুটো চা খেয়ে চলে গেল। আমরাও কিছুক্ষণ পর পা বাড়ালাম স্টেশনের পথে।

একদিন আমার সেজো মামা একটা পেপার কাটিং দেখালেন আমাকে। সম্ভবত জুন মাসের প্রথম দিকে। আকাশবাণী কলকাতার 'পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য' অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনার জন্য অডিশন আহ্বান করেছে। পরদিনই ছুটলাম ইডেন গার্ডেনের আকাশবাণী ভবনে। আমার স্বপ্নের জায়গা। রবিশংকর, আলী আকবর, নিখিল ব্যানার্জী, হেমন্ত-সন্ধ্যা-প্রতিমা-সতীনাথ-শ্যামল মিত্র-শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্র, দেবদুলাল-দেবাংশু, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজ মল্লিক-বাণীকুমার, মহালয়া, সংবাদপরিক্রমা, সংবাদবিচিত্রা, অনুরোধের আসর, শতশত শিল্পীর নাম আর অনুষ্ঠানের নাম মাথায় ঠোকাঠুকি করতে লাগল। এঁদেরকে চাক্ষুষ দেখতে পারব। আর যদি অডিশনে পাশ করি, তবে আমিও হব আকাশবাণীর শিল্পী। উত্তেজনায় আমার শরীর ভিজে যাচ্ছে। আমি রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের তালিকাভূক্ত শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও প্রচণ্ড নার্ভাস লাগছে। আমার অডিশন নিয়েছিলেন শ্রী অরুণ দত্ত এবং বিমলভূষণ। আমি অডিশন দিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি কি ফেল করেছি? ওঁরা দুজনেই হেসে উঠলেন। বিমলভুষণ বললেন, সবাই জিজ্ঞেস করে পাশ করেছি কি না আর তুমি জিজ্ঞেস করছ ফেল করেছ কি না? কী মনে হচ্ছে। ওঁদের ভাবগতিক দেখে একটু আশার সঞ্চার হল। অরুণ দত্ত বললেন, সামনের সপ্তাহেই ছটা নজরুলগীতি স্টুডিও রেকর্ডে ধারণ করা হবে। সময়মতো চিঠি পেয়ে যাবে। মনে হল যেন আমি আকাশে উড়ছি। বিমলদা বললেন, "'তুমি তো খুব ভালো গান করো। যে-গানগুলো গাইতে তোমার বেশি ভালো লাগে তেমন আট-দশটা গান খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করে আসবে, কেমন?" আমি ঘাড় দুলিয়ে বললাম, 'আচ্ছা।'

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, রেকর্ডিং-এর দুদিন আগে থেকে জ্বর সর্দিতে গলা একেবারে বসে গেল। কাশতে কাশতে মনে হচ্ছে গলার রগ ছিঁড়ে যাচ্ছে। কোনো ওষুধেই কোনো কাজ হচ্ছে না। যাই হোক, এই অবস্থাতেই চলে গেলাম আকাশবাণীর রেকর্ডিং স্টুডিওতে। বিমলদাকে বললাম যদি কয়েকদিন পর রেকর্ড করেন তো ভালো হয়। উনি বললেন, ঠিক আছে, একটা গান করো দেখি, যদি ভালো না হয়, তবে আরেকদিন করব। একজন লোককে বললেন দুটো কাপ দিতে, উনি ফাস্ক থেকে মশলা-দেওয়া চা ঢেলে আমাকে খেতে দিলেন আর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা কৌটা বার করে একটা শিকড়ের মতো জিনিস আমার হাতে দিয়ে বললেন, চা খাওয়ার পর এটা মুখে রাখবি। 'তুমি' থেকে কখন 'তুই'-তে নেমে এসেছে সম্বোধন কেউ খেয়াল করিনি। বড় ভাইয়ের মতো পরম মমতায় ছোটবোনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। রিহার্সালের জন্য স্টুডিওতে বসলাম। কী আশ্চর্য! বিমলদার অষুধ যেন মন্ত্রের মতো কাজ করল। গলাটা বেশ খুলে গেল আর কাশিও প্রায় উধাও। পাশের স্টুডিও থেকে সুর ভেসে আসছে মাঝে মাঝে 'ঝিঙে ফুল লিলেক জাতি কুল গো.. ..' কণ্ঠস্বর পরিচিত মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম–অংশুমান রায়। 'শোনো একটি মুজিবরের .. .. ..' গানটির সুবাদে পৃথিবীর সকল বাঙালির কাছে এই কণ্ঠস্বর এখন পরিচিত।

আমার গানের রেকর্ডিং শুরু হল। শেষ গান 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর।' বিমলদা টেপ রি-ওয়াইন্ড করে আমাকে বললেন– শুনে দ্যাখ পছন্দ হয় কি না। টেপ বাজছে স্টুডিওতে, ঢুকলেন ছিপছিপে চেহারার একজন ভদ্রলোক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ গানটি শুনলেন। গান শেষ হতে বললেন, "এ গান তোমার গাওয়া? নাম কী তোমার?" নাম বললাম। বললেন, "এ গানে তো কান্না ঝরছে গো!" বিমলদা বললেন, "কেমন, হল তো এবার?" সত্যি সত্যি হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললাম আনন্দে। এরপর বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানেই অংশুমান রায়ের সঙ্গে গান গাইবার সুযোগ হয়েছে। মহাজাতিসদন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো কয়েকটি স্থানে। আমার দুর্ভাগ্য একাত্তরের পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। হবেও না আর কোনোদিন।

দিনক্ষণ ঠিক মনে নেই, পত্রিকার পাতা থেকে ঠিকানা টুকে নিয়ে চলে গেলাম ১৪৪ নং লেনিন সরণীতে। গিয়ে দেখি অনেক ছেলেমেয়ে ফরাশের উপর বসে গান গাইছে। গান শেখাচ্ছেন ওয়াহিদুল হক–"সুখহীন নিশি দিন পরাধীন হয়ে ....." আমি পেছনে গিয়ে বসলাম। পরিচিত অনেক মুখই দেখতে পাচ্ছি সেখানে। শাহীন আপা, বেনু ভাই, মিলিয়া আপা, লতাদি, ডালিয়া, নায়লা, বিপুল, স্বপনদা, ফ্লোরা আরো অনেক। এত পরিচিত মুখ দেখে কী যে ভালো লাগছিল তা আর বলার নয়। এই গানের রিহার্সাল শেষ হতেই বেনু ভাই হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন, ওয়াহিদ ভাই- উঠে এলেন এক পাশে। আমি খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ওয়াহিদ ভাইয়ের কাছে গিয়ে আমার নামটা বললাম। ওয়াহিদ ভাই- এর সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় হয়নি। উনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, ও, তুমিই বুলবুল। আগরতলায় সুখেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলেছিল আমি যেন অবশ্যই তোমার খোঁজ করি। খুব ভালো হল। একটা ভয়ানক গুরুদায়িত্ব থেকে তুমি আমাকে রেহাই দিলে। আমাকে আর খুঁজে বেড়াতে হল না। বুলবুল পাখি নিজে এসেই ধরা দিল। এতক্ষণে শাহীন আপা, লতাদিও উঠে এসেছেন নিজেদের জায়গা থেকে। শাহীন আপার স্বভাবসুলভ হাসি ও পিঠে থাপ্পড় দিয়ে আপ্যায়ন করাও হয়ে গেছে। আমি বেশ দ্রুতই স্কোয়াডের সঙ্গে মিশে গেলাম। 'রূপান্তরের গান' গীতিআলেখ্য নিয়ে এই স্কোয়াড বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান করে অত্যন্ত প্রশংসা কুড়িয়েছে। সেইসাথে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা, কাপড়চোপড় সংগ্রহ করে বিভিন্ন শরনার্থী শিবিরে দান করা এবং স্কোয়াডের সকলের জন্য একটা মাসিক ভাতার বন্দোবস্ত করা, বিভিন্ন কাজে এই স্কোয়াড নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে, কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে, স্কুল কলেজের মিলনায়তনে এই 'রূপান্তরের গান' গীতি আলেখ্য কখনো আংশিক কখনো সম্পূর্ণভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছে এই গানগুলো। 'ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা' সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে', 'ওই পোহাইল তিমির রাতি' 'বল ভাই মাভৈ মাভৈ', 'কারার ওই লৌহ কপাট,' 'এই শিকল পরা ছল' 'একি অপরূপ রূপে মা তোমায়' 'জনতার সংগ্রাম চলবেই' 'ব্যারিকেড বেয়োনেট বেড়াজাল' 'ওরে বিষম দইরার ঢেউ' 'বিপ্লবেরই রক্ত রাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে', 'ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য' 'জাগো, জাগো প্রদীপ নিভায়ে দাও, গানগুলো গাইতে আমাদের যেমন ভালো লাগত, তেমনি শ্রোতারাও খুব পছন্দ করত গানগুলো।

কমলা নেহেরু স্কুলে যেদিন অনুষ্ঠান করতে গেলাম, সেদিন পরিচয় হল অনেক বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে। মৈত্রেয়ী দেবী, কাজী সব্যসাচী, বনশ্রী সেনগুপ্ত প্রমুখ। মৈত্রেয়ী দেবীর প্রতিমার মতো চেহারা। উনি আবু সয়ীদ আইয়ুবের স্ত্রী গৌরী আইয়ুবের সঙ্গে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে শিশুদের পরিচর্যা করেন, তাদের জন্য খাবার, ঔষুধপত্র, জামাকাপড় নিয়ে যান। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই দেখা হয় পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে। সত্যজিৎ রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মৃণাল সেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় আরো কতশত মানুষ! কত সাদাসিধে তাঁদের চালচলন, কথাবার্তা, কিন্তু কী অসাধারণ ধীমান, কর্মচঞ্চল সৃষ্টিশীল একত্র কজন মানুষ! বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নে তাঁরা সবাই একত্রিত হয়েছেন, কাজ করেছেন মানবিকতার জন্য।

'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পীসংস্থা' থেকে প্রত্যেককে একটা মাসিক ভাতা দেয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেটা আগেই উল্লেখ করেছি। সবাই একটা কাগজে সাইন করে টাকাটা উঠিয়ে নিতো। ওই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে কেন জানি টাকাটা কোনো দিন নিতে পারিনি। আমার নামও ডাকেনি আর আমি নিজে গিয়ে কখনো সে কথা বলতে পারিনি। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ এসে ভর করত।

বেশ কিছুদিন পর ওয়াহিদ ভাই হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তরুকে দেখতে যাবি? ফ্লোরা তোর কথা তরুকে বলেছে। তরু বলেছে তোকে নিয়ে যেতে। ফ্লোরার কাছেই শুনেছিলাম তরু আপার অসুস্থতার কথা। তিনি হাসপাতালে আছেন। আমি ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য ছিলাম। আর দলের

অনুষ্ঠানগুলোতে গান গাইতাম বলে তরু আপা, বুলু আপা সবাই আমাকে চিনতেন। ওঁরা ফ্লোরার বোন। আমরা গেলাম তরু আপাকে দেখতে। প্ল্যাকার্ড হাতে, ব্যানার হাতে শ্লোগান দিতে দিতে ছুটতে দেখেছি যে- নারীনেত্রীকে তিনি শুয়ে আছেন হাসপাতালের সাদা বিছানায়। ১৯৬৯ সালে ১১ দফার দাবীতে ছাত্র আন্দোলন তখন তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিনই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলছে। এমনকি ছাত্রদের হলে ঢুকেও পুলিশ ধরপাকড় এবং অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। ২০শে জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো এলাকা হয়ে ওঠে রণক্ষেত্র। বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে মিছিল করে, পুলিশের লাঠিচার্জ কাঁদানে গ্যাস উপেক্ষা করে। শিক্ষকরাও খালিপায়ে মিছিল করে তীব্র নিন্দা জানান।

২২ জানুয়ারি ছাত্র-জনতার ঢল নামে। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। এমনি এক প্রতিবাদ মিছিলে আমি, নাজনীন, তুকা আপা, তরু আপার পেছন পেছন শ্লোগান দিতে দিতে চলেছি 'আসাদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না'; 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না'। আমাদের মিছিলটা তখন কার্জন হলের কাছে। এমন সময় মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ শুরু করল বেপরোয়া লাঠিচার্জ আর কাঁদানে গ্যাস ছোড়া। আমাদের ঠিক সামনেই ফাটল কাঁদানে গ্যাসের শেল। ধোঁয়া, চিৎকার, দৌড়াদৌড়ি, চোখের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে হঠাৎ কে যেন আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে তীরের বেগে ছুট লাগালো। স্যান্ডেল ছিঁড়ে কোথায় চলে গেল, খালিপায়েই দৌড়াচ্ছি। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম এক হাতে আমাকে অন্য হাতে তুকা আপাকে ধরে তরু আপাই দৌড়ে বেরিয়ে এসেছেন ওই নরককুণ্ড থেকে। আমাদের দুই হাত শক্ত করে ধরে ঢাকা গেট পার হয়ে তরু আপা ঢুকে পড়লেন রেসকোর্স ময়দানের ভেতর। একটা দেয়ালের পাশ ঘেঁষে বসে পড়লাম আমরা তিনজন। নাজনীন কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে! চোখ মনে হয় কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে। তখনো চারপাশে ধোঁয়ার ঝাঁঝ। কতক্ষণ যে ওভাবে বসে ছিলাম জানি না। পরিস্থিতি যখন কিছুটা শান্ত হয়েছে আমরা তিনজন গেলাম উলটোদিকে বাংলা একাডেমীর চত্বরে। বাগানের কলের পাইপ থেকে চোখে অনেকক্ষণ ধরে জলের ঝাপটা দেয়ার পর মনে হল চোখের দৃষ্টি কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে এল। তার আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল যেন চোখটা অন্ধই হয়ে যাবে। ওখানে অনেককেই দেখতে পেলাম। তরু আপা বললেন, "তোরা এখন বাসায় ফিরে যা।" তুকা আপা জিজ্ঞেস করল,

"আপনি?" তরু আপা বললেন, "আমার দেরি হবে। আমাদের মিটিং আছে। পরবর্তী পরিকল্পনা কী হবে সেটা ঠিক করতে হবে না! তোরা যা, যুদ্ধ তো মোটে শুরু। নিজেদেরকে ভালোভাবে প্রস্তুত কর।" আমি আর তুকা আপা অনেকদূর একসঙ্গে হেঁটে এলাম। কোথাও কোনো রিকশা নেই। শেষ পর্যন্ত ঢাকা ক্লাবের কাছে এসে রিকসা পেলাম। দুজন চলে গেলাম দুদিকে। সেই তরু আপা, যুদ্ধের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন। পথ তৈরি করে দিয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন কোথায়? কত দূরে? কোনো অজানার দেশে? কী এক শূন্যতায় ছেয়ে গেল মনটা।

দেখতে দেখতে আমাদের বিয়ের প্রায় এক বছর চলল। আগামী ১৬ই অগাস্ট আমাদের প্রথম বিয়েবার্ষিকী। টুলুদার সুবাদে রীতাদি হারুদাও এইকথা জানেন। তাঁরা কী কী সব পরিকল্পনা করেছেন। গানের আসর হবে। আমার ভাইবোনরা আসবে কাঁচরাপাড়া থেকে। টুনুদি আর টিটো আসবে সোনারপুর থেকে । আর ছোট মাসিমার বাসা থেকে মাসিমা-মেশোমশাই আর তাঁদের দুই ছেলে টুটু-নোটন এবং টুটুর সুন্দরী স্ত্রী শিখা । ছোট মেশোমশাই আমাকে অসম্ভব স্নেহ করেন। ভীষণ ভালোবাসেন আমার গান । তাঁর এ অকৃত্রিম স্নেহ মাঝে মাঝে আমার কান্নার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাবাকে মনে পড়ে। আমার এত হইচইপ্রিয় বাবা, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে জড়িয়ে থাকা বাবা, অনেক দূরে নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব পরিবেশে কেমন করে দিনযাপন করেছেন!

টুলুদা সারাক্ষণই আমাকে খোঁচাচ্ছে। আর কয় দিন ধৈর্য ধর। এইতো আর বিশ দিন উনিশ দিন... আঠারো দিন...। আমার সঙ্গে টুলুদার খুনসুটি সবাই খুব উপভোগ করে। দেবর-বৌদির সম্পর্ক বোধ হয় এমনই হয়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় প্রতি দিনই মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সংস্থার রিহার্সাল কিংবা অনুষ্ঠান অথবা অন্যান্য কার্যক্রম থাকত। সন্ধ্যার পর বেশির ভাগ দিনই কাঁচরাপাড়ায় ফেরত চলে যেতাম। মাঝে মাঝে দমদমের মাসিমার বাড়িতে। আবার কখনো চলে যেতাম সোনারপুর। অগাস্টের তিন তারিখে এসেছি দমদমে। সকাল থেকেই লালাবাবুকে দেখছি খুব গম্ভীর আর চিন্তামগ্ন । ওরই ইচ্ছায় আজকে দমদমে এসেছি। যথারীতি টুলুদা শুরু করল, বাবুলদা,

আর কিন্ত মাত্র তেরোদিন । তোমাদের প্রথম বিয়েবার্ষিকীতে তুমি টুনটুনিকে কী দেবে? অনেক লম্বা বলে আমি ড্যাকি জিরাফ। ওর প্রশ্নের উত্তরে লালাবাবু বলল, আমি আর কী দেব, একটা প্রেমপত্র দেব। ওর কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ড হতাশার সুর আমার কানে খচ করে বাজল। ঠিক আছে ঠিক আছে, তা-ই দিও। কিন্ত ওকে দেয়ার আগে আমাকে দেখিয়ে নিও- তুমি যা আনরোম্যাণ্টিক! টুলুদা বলল। ও ওইরকমই। ঠাসঠুস বলে ফেলে । আমি লক্ষ করলাম লালাবাবুর মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন অদৃশ্য, কেউ যেন ওর মুখে বরফের চাঁই চেপে ধরেছে। খুব রাগ হল টুলুদার ওপর। সবসময় ওর ফাজলামি ভাল্লাগে না।

সারাক্ষণই মুখটাকে কেমন থমথমে বানিয়ে রাখল লালাবাবু। খাওয়াদাওয়াও করল না ঠিকমতো। যেন গভীর কোনো চিন্তায় মগ্ন। বাংলাদেশ থেকে কোনো খারাপ খবর এসেছে কি! আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, ভাশুর-জা, তাঁদের ছেলেমেয়েরা, কেমন আছে তারা কে জানে! লালাবাবুকে জিজ্ঞেস করলে কিছু বলছেও না, এটা ওটা বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ-হঠাৎ আমার হাত ধরে চুপচাপ বসে থাকছে। এর এই অদ্ভুত আচরণের কোনো অর্থই খুঁজে পেলাম না। টুলুদার ওই সামান্য কথায় এমন মন খারাপ করার মানুষ সে নয়। টুলুদাও একটু অনুতপ্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেছে।

পরদিন সকালে একটু দেরি করেই বের হলাম। লালাবাবু বাসাতেই থাকল। সেদিন কোনো অনুষ্ঠান ছিল না। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে ২৯শে জুলাই তারিখে পাওয়া একশো বিশ টাকার চেক ভাঙিয়ে ভাইবোন ও মার জন্য টুকটাক কিনেছি। কিছু টাকা রেখে দিয়েছিলাম আমাদের বিয়েবার্ষিকী উপলক্ষে লালাবাবুর জন্য কিছু কিনব বলে। আজ রিহার্সাল থেকে একটু আগে-ভাগেই চলে এলাম। গরিয়াহাট থেকে ২০ টাকা দিয়ে একটা পাঞ্জাবি আর একটা ফোরস্কয়ার সিগারেটের প্যাকেট কিনলাম। এতদিন চারমিনার খাচ্ছিল। ফোরস্কয়ারটা তুলনামূলকভাবে একটু ভালো আর দামি সিগারেট। তখন কুড়ি টাকায় বেশ ভালো পাঞ্জাবিই পাওয়া যেত।

সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসেছি দমদমে। রীতাদি আর হারুদাকে দেখালাম পাঞ্জাবিটা। বললেন, "খুব সুন্দর হয়েছে। বাবুলকে খুব মানাবে। কিন্তু আজকে ওর মনটা খুব খারাপ দেখলাম। দেশ থেকে কোনো দুঃসংবাদ এল কী না জানি না। এত চাপাস্বভাবের, জিজ্ঞেস করলাম কিছু বলল না। তুমি কি কিছু জান?" আমি বললাম, "না দিদি, আমাকেও তো কিছুই বলছে না। গতকাল থেকেই

দেখছি মন খুব খারাপ। কখন ফিরবে কিছু বলেছে?" রীতাদি বললেন, "আমাকে তো কিছু বলেনি, দুপুরের খাওয়ার পরপরই বেরিয়ে গেল।" হারুদাও কিছু জানেন না। টুলুদাও ফেরেনি এখনো।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ডুবন্ত সূর্যটা কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছে। শহীদের রক্তের মতোই লাল হয়ে আছে পশ্চিমের আকাশ। লাল ছোট ছোট ফুলে ছেয়ে আছে মাধবীলতার ঝাড়। বারান্দা থেকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। ঘরে-ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কেমন একটা হাহাকারের মতো বাতাসের ঝাপটা এসে মুখে লাগল! মাধবীলতার ঝাড়টা দুলে উঠল মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে। দরজায় কলিংবেল বাজতেই দ্রুত চলে এলাম সিঁড়ির কাছে। না, লালাবাবু নয় টুলুদা ফিরেছে।

অন্যদিনের মতো ইয়ার্কি-ফাজলামি শুরু না করে টুলুদা একটা খাম এগিয়ে দিল। "বাবুলদা দিয়েছে।" রীতাদিও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন মুখে নিয়ে। খামটা হাতে নিলাম। নীল নয়, সাদা খাম। আমার ভেতরে কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো জিজ্ঞাসা নেই, ভয় নেই, আশঙ্কা নেই, কিছুই নেই। খামের মতোই সাদা।

টুলুদা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ড্রইংরুমে। সোফায় বসে বলল, "খোল খামটা। আমি জানতে চাই ওতে কী আছে।" ওর কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে উষ্মা ও উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ল। খামটা খুললাম। ছোট্ট একটা চিঠি আর একশো টাকার একটা নোট। চিঠিতে লেখা: আমি ট্রেনিং এর জন্য চাকুলিয়া যাচ্ছি। কতদিনের ট্রেনিং, এরপর কী করতে হবে কিছুই জানি না। শুধু জানি, আমি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যাব। তুমিও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছ তোমার মতো করে। যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেঁচে ফিরে আসতে পারি তবে আবার দেখা হবে।

চিঠিটা টুলুদার হাতে দিলাম। চিঠিটা পড়ে টুলুদা অস্পষ্ট স্বরে কী বলল বুঝতে পারলাম না।

সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের কোনো-একদিন 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার' অনুষ্ঠান শেষ করে কাঁচরাপাড়ায় ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাসায় ফিরে ঘরে ঢুকতেই বুকের ভেতর সাত সমুদ্র আছড়ে পড়ল। চৌকির ওপর লালাবাবু একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে বসে আছে। প্রথমে আমাকে দেখতে পায়নি। আমার ভাইবোনদের চেঁচামেচিতে ওপরে মুখ তুলতেই আমাকে দেখে হাসি-কান্নায় মেশা একটা চেহারা বানিয়ে এগিয়ে এল। মা ইশারায় সবাইকে

বাইরে যেতে বলে বারান্দায় রাখা চুলোর কাছে গিয়ে বসলেন খাবার গরম করতে। আমাকে জড়িয়ে ধরে লালাবাবু নীরবে চোখের জলে ভাসতে লাগল। আমারও একই অবস্থা।

সেই দিনই চাকুলিয়া থেকে ছয় সপ্তাহের ট্রেনিং শেষ করে কল্যাণীতে ফিরে রিপোর্ট করেই চলে এসেছে কাচরাপাড়া। কিন্তু আমি ততক্ষণে বেরিয়ে গেছি। সারাদিন আমার অপেক্ষায় থেকে ওর মানসিক অবস্থা কী হয়েছিল, এই নীরব অশ্রুপাতই তা বলে দিল। পরদিন সকালেই আবার চলে যেতে হবে। কোথায় ওর পোস্টিং হবে কিছুই জানে না। সারারাত শুধু কান্নাকাটি করেই জেগে থাকলাম দুজন। মাঝে মাঝে শুধু দুজনেই প্রতিজ্ঞা করলাম দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে সবসময় প্রস্তুত থাকব। আমাদের কোনো-একজন যদি চিরদিনের জন্যও পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাই, তবুও কোনো আক্ষেপ করব না। ভাবব আমার প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রিয়তম মানুষটিকে উৎসর্গ করেছি।

ভোরের ট্রেন ধরে লালাবাবু চলে গেল কল্যাণী। কল্যাণী কাঁচরাপাড়ার পরের স্টেশন। আমি সেদিন আর কলকাতা গেলাম না। দুপুরের পর আবার এল লালাবাবু। মুখে বেশ একটা খুশি-খুশি ভাব। কারণ জিজ্ঞেস করতেই বলল, আজকে আমাদের মুভমেণ্ট অর্ডার হয়েছে। আমি প্রথম চারজন কমিশন পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের একজন। ৫ নং সেক্টরে আমাকে যেতে হবে সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে। আমি এখন লেফটেন্যান্ট এস. কে. লালা। আমি একটু রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে কি স্যাল্যুট করতে হবে? ও আমাকে বুকের ভেতর অনেক্ষণ জড়িয়ে ধরে রেখে বলল, চিন্তা কোরো না, শহীদ হয়ে নয় যুদ্ধ জয় করে স্বাধীনতা নিয়েই আবার তোমার কাছে ফিরব।

দশ-বারো দিন পরই একটা চিঠি পেলাম। বালাত থেকে লেখা। গতকাল আমার কম্যান্ডে একটি দল নিয়ে গিয়েছিলাম যুদ্ধক্ষেত্রে। সুশিক্ষিত পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু মর্টার, এস.এম.জি. আর কয়েকটা এল.এম.জি. নিয়েই দশ-বারো জন পাকসেনা খতম করে ফিরে এসেছি। আমাদের সঙ্গে গৌরাঙ্গ দাশ বলে অসম সাহসী একটি ছেলে আছে, ওর বাড়ি সিলেটেই। সুনামগঞ্জ আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র।

চিঠি পেয়ে একই সঙ্গে আনন্দ এবং ভয় জড়িয়ে ধরল সমস্ত মস্তিষ্ক। হয়তো কয়েকশো বার পড়েছি সেই চিঠি।

রোজকার মতো শেয়ালদা স্টেশনে নেমে, বাসে চড়ে যাচ্ছি লেনিন সরণীর 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র একটা বড় অনুষ্ঠানের রিহার্সাল আছে। আমি বসে আছি বাসের দরজার কাছ ঘেঁসে জানালার দিকের সিটে। বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি মানুষের ছুটে চলা। কলকাতার মানুষ যেন দাঁড়িয়ে থাকতে জানে না। কেবলই দৌড়ে চলে, ছুটে বেড়ায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখার সময় নেই। ঠ্যালাঠেলি ভিড়-ভাট্টার মধ্যেও নিয়মভঙ্গ করার অভ্যেস কম। শুধু উদ্বাস্তু মানুষের চাপে ধৈর্যহারা হয়ে কেউ কেউ কখনো কখনো উলটোপালটা মন্তব্য করে। ট্রেনে, বাসে আর ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'জয় বাংলার' মানুষের টিকেট লাগে না, ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে লাগে। আমি মাঝে মধ্যে ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে চড়ার আয়েসটুকু করি। সেদিন একটা ফাঁকা বাস পাওয়াতে বেশ আরাম করে জানালার পাশের সিটটা দখল করে নিলাম।

দুচারটা স্টপেজ পার হওয়ার পর একটা স্টপেজের কাছে বাসটা দাঁড়াল। হঠাৎ একটা পরিচিত মুখ দেখে হার্টবিট বেড়ে গেল। বাসে তখন প্রচণ্ড ভিড়। সেও আমাকে দেখতে পেয়েছে। একটু দূরে ছিল, দ্রুত দৌড়ে জানালার কাছে চলে এল। বাস ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম রোকো, রোকো, থামুন থামুন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে প্রায় দরজার কাছে চলে এসেছি। উপায়ন্তর না দেখে সেও চলন্ত বাসের পা-দানিতে উঠে পড়েছিল। বাসের অন্যান্য যাত্রীদের অনুরোধে ততক্ষণে অবশ্য কনডাকটারও বাস থামানোর সংকেত দিয়েছে আর বাস চালকও বাস থামিয়েছে। আমরা দুজনেই বাস থেমে নেমে পড়লাম। কোথায় রইল লেনিন সরণী, কোথায় রইল রিহার্সাল।

এতোদিন পর এই ভাবে রুনুদার (সাংবাদিক আবেদ খান) সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেও পারিনি। একই পাড়ায় সেই ছোট্টবেলা থেকে বড় হয়েছি। সব ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্যারম খেলা, কবিতা পড়া, তাস খেলা, আড্ডামারা, রবীন্দ্র নজরুলকে ভালোবাসা সাহিত্যচর্চা সবকিছুতেই রুনুদা ছিল আমাদের পরিবারের অংশ আর বড় ভাই হিসেবে এখনো তার স্থান একই রকম। বিপদে-আপদে এখনো সবাই তার কাছে ছুটে যায়।

বাস ছাউনির ভেতরে খালি একটি সিট পেয়ে দুজন বসলাম। কত কত কথা যে জমা হয়ে আছে! অনর্গল বকে চলেছি দুজন। কোন কথা আগে কোন কথা পরে তার ঠিক নেই। সারা সকাল এদিক ওদিক ঘুরে প্রায় দুপুর বারোটা নাগাদ গেলাম আকাশবাণী ভবনে। এর আগে কয়েকবার আমি এসেছি এখানে। অডিশন এবং রেকর্ডিং উপলক্ষ্যে। রুনুদা এখানে 'জবাব দাও' অনুষ্ঠান করে।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সরল গুহর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সরলদা তাঁর সামনের চেয়ারে বসা ধুতি পরা, শ্যামলামতো, শান্ত নিরীহ চেহারার একজন ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, "এঁকে চেনো?" আমি ঘাড় নাড়ালাম, চিনি না। সরলদা বললেন, "আচ্ছা, এবার তোমাকে ধাঁধার উত্তর দিতে হবে।" সামনের ভদ্রলোক মিটিমিটি হাসছেন। "গল্পের বই পড়?" "হ্যাঁ, ওটাই তো পড়ি।" সবাই আমার বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল। সরলদার পরের প্রশ্ন, "কার লেখা পড়তে ভালো লাগে?" আমি বললাম, "রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বনফুল, আশাপুর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" ব্যস-ব্যস, অনেক বলেছ। তোমার ভালো লাগার তালিকায় এঁর নামও আছে। এবার বলো ইনি কে?" আমি মনে-মনে নানারকম হিসাব-নিকাশ করে একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে উঠলাম 'শ্বেতময়ুর'! ভদ্রলোক একটু মৃদু শব্দ করে হাসলেন। সরলদা অবাক হয়ে বললেন, "সে কীরে? ওঁকে তোর শ্বেত ময়ূর মনে হলো? এ নাম তো তোর তালিকায় ছিল না। ইনি নরেন্দ্রনাথ মিত্র।" এতক্ষণে মিত্র খুব সলজ্জ ভঙ্গিতে, নরম হাসিমাখা স্বরে বললেন, "না না, ও ঠিকই বলেছে। ওটা আমার একটা গল্পের নাম। তরুণ-তরুণীরা এই গল্পটা পছন্দ করে। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে নাটকও হয়েছে।" সরলদা হো হো করে হেসে বললেন, "তা-ই বলো, এ আমারই অজ্ঞতা। আমি ভাবছি এমন একটা ছদ্মনামের কথা তো আমি জানি না, তা ছাড়া গাত্রবর্ণের সঙ্গেও মিল নেই।" আবেদ খানকে দেখিয়ে বললেন, "ওকে বললে তবুও-বা কথা ছিল।" আবেদ খান হেসে বলল, "পাগলাকে বলে, সাঁকো নাড়াসনে।"

আস্তে আস্তে কথার মোড় ঘুরল। দেশবিভাগ, ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান সবশেষে মুক্তিযুদ্ধ। সরলদা কথায় কথায় বললেন, "দ্যাখো সব মুক্তিযুদ্ধই কিন্তু স্বাধীনতা আনতে পারে না। বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের মতোই বলতে হয়, বাঙালি শুরু করে খুব জোরোশোরে কিন্তু শেষ করতে পারে না।" এই কথায় হঠাৎ আমি খুব ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ফেললাম, "বুড়ো হয়েছেন তো, আপনার হাড়ে আর জোর নেই, সবকিছুতেই পিছুটান আর ভয়, রবীন্দ্রনাথ যখন একথা বলেছিলেন বোধকরি তাঁরও অনেক বয়স হয়েছিল। বাঙালি তরুণরা কী করতে পারে তা আপনাদের ধারণায় কুলাবে না।" এখন বুঝতে পরি, কী নির্দয় আর রূঢ়ভাবে কথাটা বলেছিলাম। একজন সম্মানিত বয়স্ক মানুষকে কী নিষ্ঠুরভাবে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলাম!

সরলদা হয়তো এতটা আশঙ্কার কথা বলেছিলেন, আক্ষেপ করে। কিন্তু তিনি আমার সেন্টিমেন্টটা বুঝতে পেরেছিলেন। আমার এই আক্রমণাত্মক বিচ্ছিরি কথাগুলোকে বালিকাসুলভ আচরণ বলেই মনে করেছিলেন। হেসে বলেছিলেন, "এ যে ধানিলঙ্কা! তোমরা পারবে, তোমরাই পারবে।" থমথমে পরিবেশটা অনেকটা অনেকটা সহজ হল। ঠিক সেই সময়ই ঘরে ঢুকলেন দুজন ভদ্রলোক। একজন একটু শ্যামলা, স্বাস্থ্য ভালো, তেজী বৃদ্ধিদীপ্ত চেহারার, অন্যজন চলচ্চিত্রের নায়কের মতোই অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। সরলদা আমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম জন 'সংবাদ পরিক্রমা'র লেখক প্রণবেশ সেন, দ্বিতীয় জন 'সংবাদ বিচিত্রা'র প্রযোজক উপেন তরফদার টেপরেকর্ডার হাতে যত্রতত্র ছোটাছুটি করে যুদ্ধের বিষয়ে, পাকসেনাদের নৃশংস হামলার বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং সংবাদ গ্রহণ করে আনেন। কখনো কখনো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকেও সংবাদ সংগ্রহ করেন। উপেন তরফদারের 'সংবাদ বিচিত্রায়' প্রচারিত "শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি" গানটি এখন পৃথিবীর সব বাঙালির মুখে-মুখে। এই গানের ইংরেজি অনুবাদ করেও গাওয়া হয়েছে। এই সংবাদ বিচিত্রার মাধ্যমেই আমরা শুনেছি কলকাতায় নিযুক্ত তৎকালীন পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলীর বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ঘোষণা আর মিসেস হোসেন আলীর অবরুদ্ধ কণ্ঠে পাকসেনাদের নিষ্ঠুর নৃশংস নারকীয় অত্যাচারের বর্ণনা বলতে বলতে তিনি হাউমাউ করে কাঁদছিলেন আর কেঁদে উঠেছিল প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষ। ধিক্কার জানিয়েছিল এই নারকীয়

গণহত্যার খলনায়কদের। গণমাধ্যমগুলো যুদ্ধের সময় যে কী জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে তা সেদিন বুঝেছিলাম। আর নিরলস প্রচেষ্টায়, বাংলাদেশের মুক্তিকামী নিরস্ত্র মানুষের প্রতি গভীর-নিবিড় ভালবাসায়, নেপথ্যে থেকে যাঁরা এই অসাধারণ কাজ করে যাচ্ছিলেন সেই মহানায়কদের চোখের সামনে দেখে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। শ্রদ্ধা ও বিস্ময়মেশানো চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলাম, শুনলাম কত সহজ সরল তাঁদের কথাবার্তা, চলাফেরা অথচ কী অমিত তেজ এবং মানসিক শক্তির অধিকারী দুজন মানুষ।

সরলদা বললেন, "জানো, এঁরা সপ্তাহে সাত দিনই ভোর থেকে রাত একটা-দেড়টা, কখনো কখনো দুটো-তিনটে অব্দি কাজ করেন। গত কয়েক মাসে একদিনও ছুটি নেননি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন না?'

দেবদুলালের নামই শুধু নয়, প্রায় সব বাঙালির কাছে দেবদুলালের কণ্ঠও ভীষণ পরিচিত এবং আপন। আমার মনে পড়ে, বহুদিন আগে, আমাদের নারিন্দা এলাকায় বন্যার জল উঠেছিল। আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ পাঠকালে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা বলেছিলেন। আর সমস্ত পাড়ায় কী হইচই! "দেবদুলাল নারিন্দার কথা বলেছে, দেবদুলাল নারিন্দার কথা বলেছে।" দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও নয়, বলেছেনও নয়। যেন আমাদের পাড়ার মানিক বা করিম আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা সবাইকে জানিয়েছে। সেদিন দেবদুলাল এলেন না। পরে অবশ্য অনেকবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

এরপর যতবার 'সংবাদ বিচিত্রা' বা 'সংবাদ পরিক্রমা' শুনেছি, চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সৌম্যদর্শন উপেনদা টেপরেকর্ডার-কাঁধে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য ছুটছেন, বুদ্ধিদীপ্ত তেজী চেহারার প্রণবেশ সেন মাথা গোঁজ করে অগ্নিঝরা বাক্য লি‌ে চলেছেন আর দেবদুলাল তাঁর জাদুমাখা ভরাট কণ্ঠে আবিষ্ট করে রেখেছেন শ্রোতাদের।

আকাশবাণী ভবন থেকে বেরিয়ে দুপুরের খাবার খেতে চলে গেলাম নিউমার্কেটের কাছে। মানুষে টানা রিকশায় চড়তে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করি। কেমন যেন অমানবিক মনে হয়। কিন্তু এতটা রাস্তা হেঁটে যাওয়ার অভ্যাসও নেই। সুতরাং দুপুরের রোদে কিছুটা হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার ফলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই টানা রিকশায় চড়ার সিদ্ধান্তই নিলাম। এই ভাবেই মানুষ হয়তো কখনো কখনো জীবনের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত কীভাবে একটা সুন্দর সময় কাটানো যায় তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলতে থাকল। রুনুদাই প্রস্তাব করল, "চলো, সিনেমা দেখতে যাই। মেট্রোতে গানস্ অব নেভারন চলছে।" একবাক্যে রাজি হয়ে গেলাম। ভালো সময় কাটানোর এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর কী হতে পারে। ছবি শেষ হওয়ার পর রুনুদা শেয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত এসে আমাকে ট্রেনে তুলে দিল। ততক্ষণে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে। ট্রেন চলতে শুরু করল, রুনুদা হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের ‘পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য’ অনুষ্ঠানে প্রচারের উদ্দেশ্যে আমার কণ্ঠে ছয়টা নজরুল সংগীত স্টুডিও রেকর্ডে ধারণ করার পর নিজেকে সত্যিই খুব ভাগ্যবতী মনে হল। কখনো কল্পনাও করিনি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে আমার গাওয়া গানের রেকর্ড বাজবে। বাংলাদেশ থেকে আমার আত্মীয়স্বজনেরা প্রায়শই সে গান শুনেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে আমি বেঁচে আছি। এ ছাড়া তারা এটাও ধারণা করেছে যে সেই সময় আমি যেখানে, যাদের কাছে ছিলাম তারাও বেঁচে আছে। বিশেষ করে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন যারা চট্টগ্রামে ছিল তারাও নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে যে আমি এবং আমার স্বামী পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলির শিকার হইনি।

ওয়াহিদ ভাই ও সনজিদা আপা পরিচালিত ‘মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা’র সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে পেরেও মনে হয়েছে অন্ততঃ কিছু কাজ তো করতে পারছি দেশের জন্য। এই সংস্থার সঙ্গে অবশ্য খুব বেশি দিন ছিলাম না। অনিবার্য কারণেই সেখান থেকে আমার সম্পর্ক গুটিয়ে নিয়েছিলাম।

মাঝে মাঝেই একটা বিষয় আমাকে খোঁচাতে থাকে-তা হল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইংরেজি বাংলা সংবাদ, জল্লাদের দরবার, চরমপত্র, বজ্রকণ্ঠ, বেশ কিছু উদ্দীপনামূলক সমবেত সংগীত শ্রোতাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সূচনা সংগীত ‘জয়বাংলা, বাংলার জয়’ গানটি শুনলেই বুকের ভেতর আছড়ে পড়ত সাত সাগরের ঢেউ। কিন্তু কী করে সেখানে পৌছাব। কোথায় এর অবস্থান। কলকাতা থেকে কত দূর!!! নানা ধরনের প্রশ্ন মনের ভেতর ঘুরপাক খায়।

'মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সংস্থা'র অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু কেউই ঠিকমতো বলতে পারে না বা বলে না। হয়তো গোপনীয়তা রক্ষার জন্য। একদিন সাহস করে ওয়াহিদ ভাইকে জিজ্ঞেস করাতে উনি ঠিকানাটা বললেন।

সেই দিনই কাঁচরাপাড়া ফেরার পথে শিয়ালদা স্টেশনে এক ভদ্রলোককে দেখে চমকে উঠলাম। উনি আমাকে খেয়াল করেননি। সঙ্গে আরেক ভদ্রলোক আছেন, যাঁকে দেখে আমি চিনতে পারছি না।

কাঁচরাপাড়াগামী ট্রেনের একই কম্পার্টমেন্টে উঠেছি আমরা। প্রায় মুখোমুখি সিটেই বসেছি। ট্রেনে অনেক ভিড় কাজেই কথা বলার খুব একটা সুযোগ ছিলনা। মাঝে মাঝেই চোখাচোখি হতেই আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছি অন্যদিকে। কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল পরিচয় দিতে। কারণ তিনি আমাকে চিনতে পারেননি। কিন্তু ওঁরা দুজন যে আমাকে নিয়ে কথা বলছেন তা তাঁদের ভাবভঙ্গি এবং আমার দিকে তাকানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছি।

কাঁচরাপাড়ায় নামতেই তাঁরা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার পূর্বপরিচিত ভদ্রলোক সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আপনি কি অরুণদার মেয়ে?" হেসে জবাব দিলাম 'হ্যাঁ'। বুঝলাম উনিও আমাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি বুলবুল, তাই না?' বললাম, 'জ্বী, আর আপনি রাজু আহমেদ আমাদের রাজু কাকু। 'হ্যাঁ', অনেক বছর পর দেখা। শেষ বার তোমাকে দেখেছি যখন তখন তোমার বয়স দশ এগারো বছর। প্রায় ছয় সাত বছর আগের কথা, তাই না? আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালাম। পাশের ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, "ইনি কল্যাণ মিত্র। নাট্যকার। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ওঁর ধারাবাহিক নাটক 'জল্লাদের দরবার' বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। অনেকেই শোনে।" আমার চোখ চকচক করে উঠল। ইনিই নাট্যকার কল্যাণ মিত্র, আশ্চর্য! এঁর লেখা মঞ্চনাটকগুলো অন্য রকম। বেশ পুরোনো ধাঁচের এবং বেশি মাত্রায় মোলোড্রামাটিক। কিন্তু 'জল্লাদের দরবার' কী ধারালো, সংলাপগুলো কী বাস্তবমুখী। কিন্তু পুরো নাটকটা রূপকধর্মী। সকলেই জানে সব চরিত্রগুলোই প্রতীকী। "আমরাও সবাই শুনি, খুবই ভালো লাগে।" আমি বললাম, রাজুকাকু মা-বাবা সকলের কথা শুনে বললেন, "অরুণদাকে আসার জন্য চিঠি লিখে দাও। উনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেই অনেক অবদান রাখতে পারবেন। কী ভালো ওঁর লেখার হাত, কী অসম্ভব সুন্দর অভিনয়!"

স্টেশন থেকে আমাদের বাসা খুব একটা দূরে নয়। গল্প করতে করতে হেঁটেই চলে এলাম বাসায়। রাজু কাকুকে দেখে মার বেজায় খুশী। কতদিন পর দেখা। হঠাৎ করে কল্যাণমিত্র আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "জল্লাদের দরবারে'

অভিনয় করবেন?'"এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে আমি হকচকিয়ে গেলাম। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকলাম। এমন করেই সুযোগ এসে যায়! বিশ্বাসই হচ্ছে না নিজের কানকে। গত কদিন ধরে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের খোঁজ কীভাবে পাব সে চিন্তায় অস্থির হয়ে ছিলাম, আর আজ জল্লাদের দরবার নাটকের নাট্যকার স্বয়ং আমাকে অভিনয় করার অফার দিচ্ছেন। সত্যিই অভাবনীয়। যাই হোক ওঁদের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ঠিকানা নিয়ে নাটকে অভিনয় করার ব্যাপারে আমার সম্মতি জানালাম। সকালেই ওয়াহিদ ভাইয়ের কাছ থেকেও ঠিকানাটা নিয়েছিলাম। এবার ভালো করে লোকেশনটা বুঝে নিলাম।

পরদিন সকালে আমার বড় ভাই তরুণকুমার মহলানবীশকে নিয়ে চলে এলাম বালীগঞ্জের 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে'। পথে রথীন্দ্রনাথ রায়সহ পূর্বপরিচিত আরো দু-একজনের সঙ্গে দেখা হল। জানতে পারলাম লোহানী ভাই (কামাল লোহানী) সেখানকার একজন কর্মকর্তা।

গেটের সামনে যেতেই আমাদের আটকে দিল। রথীনদার অনুরোধেও ছাড়ল না। আমি একটা কাগজে আমার নাম লিখে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে লোহানী ভাইয়ের কাছে তা পাঠালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। সমর দাশ, অজিত রায়, আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, কাদেরী কিবরিয়া, লাকী আখন্দ, রফিকুল আলম, অরুণ গোস্বামী, সুনীল গোস্বামী, সুবল দত্ত যাঁদেরকে ঢাকা থেকেই চিনতাম সংগীতের জগতে থাকার কারণে। সুবলদা, অরুণদা, সুনীলদা রেডিও টিভিতে আমার সঙ্গে বেহালা আর তবলা বাজিয়েছেন। লাকী আখন্দ আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর সবাই আমার সিনিয়র শিল্পী এবং সংগীত পরিচালক। নাট্য জগতেরও অনেককে দেখলাম। এমনি আরো অনেক চেনা মানুষ। কিন্তু রাজু আহমেদ বা কল্যাণ মিত্রকে দেখতে পেলাম না। ভেতরে ভেতরে একটু দমে গেলাম। আমাকে আসতে বলে ওঁরা কোথায় গেলেন। লোহানী ভাইকে ওঁদের কথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, "ওঁরা বোধ হয় দুপুরের দিকে আসবেন। তুমি সমরদা আর অজিত রায়ের সঙ্গে গানের রিহার্সাল করতে চলে যাও।"

ব্যস সেই শুরু হল গানের রিহার্সাল বেতারকেন্দ্রের কাছাকাছি একটা বাসায় ছাদ ঘরে। ঘরটা মোটামুটি বড়ই। বিশ-ত্রিশ জন বসা যায়। কিছুক্ষণ পর অনেকেই এল। কল্যাণী ঘোষ, উমা চৌধুরী, নাসরীন আহমেদ শিলু, রমলা সাহা, সত্য সাহা, রূপা খান, মালা খান, অরূপরতন চৌধুরী, তপন ভট্টাচার্য,

প্রবাল চৌধুরী প্রমুখ। রথীনদা, লতা ভাই ছাড়া আরো কয়েকজন আগে থেকেই ছিলেন যাঁদেরকে আমি চিনি না। সকাল এগারোটা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত একটানা রিহার্সাল চলল। সমরদা শেখাচ্ছিলেন তাঁর সুর করা অবিস্মরণীয় দুটো গান। গোবিন্দ হালদারের লেখা 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' আর নঈম গওহরের 'নোঙ্গর তোলো তোলো'।

দুপুরে যে যার পছন্দ ও সামর্থ অনুযায়ী খাবার খেয়ে আবার রিহার্সাল। এইবার দেখা হল রাজুকাকু আর কল্যাণ মিত্রের সঙ্গে।

আমি মূলত সংগীতশিল্পী। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে আমি সংগীতশিল্পী হিসেবেই তালিকাভুক্ত ছিলাম। কাজেই সংগীত বিভাগের সঙ্গেই পুরোপুরি সম্পৃক্ত হলাম। সঙ্গে 'জল্লাদের দরবার' নাটকে। কেল্লাফতে আলী খানের ভূমিকায় ছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী অভিনেতা রাজু আহমেদ। দুর্মুখ অর্থাৎ বিবেকের চরিত্রে রূপদান করতেন নারায়ণ ঘোষ মিতা। অনেকটা কৌতুকাভিনয়ের আঙ্গিকে প্রচণ্ড শক্ত শক্ত কথা তিনি বলতেন। অপূর্ব ছিল এই দুটি চরিত্রচিত্রন। আমার সৌভাগ্য যে এমন জনপ্রিয় এবং উঁচুমানের একটি ধারাবাহিক নাটকে আমি অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম। এই নাটকে আরো ছিলেন প্রসেনজিৎ বসু, আজমল হুদা মিঠু, ফিরোজ ইফতেখার, কাকিয়া বসু, তরুণকুমার মহলানবীশ প্রমুখ। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ শিল্পী ছিল আমার ছোট বোন শিল্পী মহলানবীশ। ওর তখন মাত্র সাত বছর বয়স। জল্লাদের দরবারসহ বেশ কয়েকটা নাটকেই ছোট্ট মেয়ের ভূমিকায় রূপদান করেছে সে। আমার মেজো বোন মুক্তি মহলানবীশও নিয়মিতভাবে অংশ নিয়েছে সংগীতে। আমরা চার ভাই বোনই স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পী। মালা খান, রূপা খান, রুমু খান ও ঝুমু খান ওরা চারা ভাইবোনও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শব্দসৈনিক। একই পরিবার থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারে সর্বাধিক অংশগ্রহণের উদাহরণ সম্ভবত এই দুটিই।

ধীরে ধীরে অন্যান্য নাটক এবং আশরাফুল আলমের সঙ্গে 'বাংলার মুখ' নামক জীবন্তিকাতেও অভিনয় করতে থাকলাম। ইতোমধ্যে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ব্যানারে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ সরকারের জন্য অর্থ সংগ্রহ, ওষুধপত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে দেয়া, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠন করা এ সবই ছিল এই অনুষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য। সমর দাশ,

অজিত রায়, সুজেয় শ্যাম প্রমুখের সুর করা অসাধারণ কিছু গান তখন আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতাম। সমরদার সুরে 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'নোঙ্গর তোলো', অজিতদার সুরে 'স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে', সুজেয় শ্যামদার সুরে 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' 'মুক্তির একই পথ সংগ্রাম' ইত্যাদি। এ ছাড়া শেখ লুৎফর রহমান, সুখেন্দু চক্রবর্তী, আলতাফ মাহমুদের সুরে বিভিন্ন কবি-গীতিকারের লেখা গান আমরা পরিবেশন করতাম সমবেত কণ্ঠে কিংবা এককভাবে। সিকান্দার আবু জাফর, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সত্যেন সেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, রাহাত খান, আবু বকর সিদ্দিক এমনি অনেকেই ছিলেন সেই তালিকায়। এ ছাড়া রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত-জীবনানন্দ এবং দ্বিজেন্দ্র-অতুল-রজনীকান্ত এঁদের গান গেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে।

ধীরে ধীরে শিল্পীর সংখ্যাও বেড়েছে, দলের সংখ্যাও বেড়েছে, গোষ্ঠীর সংখ্যাও বেড়েছে, অনুষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে। সকলেই নিজের অবস্থানে থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। 'শরণার্থী শিল্পী গোষ্ঠী' অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মঞ্চায়ন করেছে নৃত্যালেখ্য 'এক পথিকের আত্মকথা'। রচয়িতা বিপ্লব দাশ, নৃত্য পরিচালনায় কমল সরকার, সংগীত অনুপ ভট্টাচার্য। সংগীতাংশে আমি, মিতালী মুখার্জী, রফিকুল আলম, অনুপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। শেষের দিকে তিমির নন্দী এসেও যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে।

পণ্ডিত বারীণ মজুমদার তাঁর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরী করেছিলেন। এমনি অনেক সংগঠন ছিল। যাদের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। স্বাধীনতা যুদ্ধে এদের কারো অবদানই তুচ্ছ করার মতো নয়। পশ্চিমবঙ্গের তথা সমগ্র ভারতের মানুষ যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তা আমাদের চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা উচিত। কবি, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ জনতাও আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার পক্ষে যেভাবে কাজ করেছেন শুধু কৃতজ্ঞতা দিয়ে সেঋণ শোধ করা যাবে না।

কাঁচরাপাড়া থেকে শেয়ালদা স্টেশনে নেমে, তারপর ট্রাম কিংবা বাসে করে চলে যেতাম বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে। 'জয় বাংলা'র লোকদের জন্য কোনো টিকেট লাগত না। প্রথম দিকে আইডেন্টিটি কার্ড বা রেশন কার্ড দেখাতে হতো। পরের দিকে মুখে বললেই হতো যে আমরা 'জয় বাংলা'র লোক। এমনি একদিনের ঘটনা। ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। অফিস যাত্রী, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন পেশার মানুষে গিজ গিজ করছে ট্রেন। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে পাঁচ-ছয় জন তরুণ-তরুণী দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কেই কথা বলছিল। ওদের কথায় বুঝতে পারলাম, ওরা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। যাচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। ওদের সকলের কাছেই টিকেট আছে। আমার নেই, আমাদের লাগেনা। টিকেট চেকার টিকেটের কথা জিজ্ঞেস করতেই বললাম, 'আমি জয় বাংলা'র লোক। লোকটি প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল আমার ওপর। 'জয় বাংলা'র লোক, সবাই জয় বাংলার লোক লোক, টিকেট না থাকলেই জয়বাংলার লোক, ভাঁওতাবাজি? লজ্জায় অপমানে আমি ঝরঝর কেঁদে ফেললাম। সকলের দৃষ্টি আমার দিকে। ব্যাগ হাতড়ে দেখলাম, টিকেটের পয়সা দিয়েও বাস ভাড়া দুপুরের খাওয়ার খরচ কোনো ভাবে চলে যাবে। আমি বললাম, "আপনি টিকেটের পয়সা নিন, কিন্তু আমি 'জয়বাংলার'ই লোক।" লোকটা তবুও গজর গজর করতে লাগল।

এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েগুলো চুপচাপ দেখছিল। হঠাৎ আঠারো-উনিশ বছর বয়সী একটি ছেলে টিকেট চেকারের কলার চেপে ধরল

'বেশি বেশি এফিশিয়েন্সি দেখানো হচ্ছে, না? এক্কেবারে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।' আমি সমস্ত ব্যাপারটা দেখে লজ্জায় শিঁটিয়ে গেলাম। অন্যান্য যাত্রীরাও টিকেট চেকারকে তিরষ্কার করতে লাগল। টিকে চেকার পালিয়ে বাঁচল। ছেলেমেয়েগুলো আমার কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। আমি ওদেরকে বললাম, "আসলে ওই ভদ্রলোকের তো কোন দোষ নেই। তিনি তো তাঁর ডিউটি পালন করছিলেন। আর আমার পোশাক-আশাক কথাবার্তায় হয়তো মনে হয়নি যে আমি জয় বাংলার লোক, শরণার্থী।" ওরা আমার কথায় হেসে বলল, "আপনি তো বেশ মানুষ, এত কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পরও টিকেট চেকারের পক্ষ নিয়েই কথা বলছেন।" সারাটা পথ ওদের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের ঘটনাবলী, শরণার্থীদের সমস্যা, মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান অবস্থা নানা বিষয়েই কথা হলো। দেখলাম ওরা বেশ ভালোই খবর রাখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বর্তমান অবস্থার, কিন্তু যুদ্ধপূর্ববর্তী খবর অনেক কিছুই জানে না। ভাষা আন্দোলন বা একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে ওদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। এই আন্দোলন যে শুরু হয়েছিল '৪৮ সাল থেকেই, যখন পাকিস্তান গণপরিষদে কংগ্রেস দলীয় সাংসদ ধীরেন দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও অফিস-আদালতের ভাষা এবং রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়ার প্রস্তাব করেন। তখন লিয়াকত আলি খানের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং এই প্রস্তাবের বিরোধিতার ফলে তখন থেকেই পূর্ববঙ্গে শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যার ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভেঙে ছাত্র-জনতা ঢাকাকে পরিণত করেছিল মিছিলের নগরীতে আর পুলিশের গুলিতে কালো পিচ ঢালা পথ ভেসে গিয়েছিল শহীদের রক্তে সে খবর খুব ভালোভাবে তাদের জানা নেই। আমরা যে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাত ফেরি করে, নগ্ন পায়ে, শহীদ মিনারে ফুল দিতে যাই হাজার হাজার মানুষ, সে কথা শুনে অনেকেই বিস্মিত হলো। কেউ কেউ আবার খাতা-কলম নিয়ে নোট নিতে লাগল। শেয়ালদায় নেমে যাওয়ার পর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। ওরাও আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করেনি আমিও ওদের কথা জানতে চাইনি। ওদের কারো সাথে আমার আর কখনো দেখা হয়নি। কিন্তু চেহারাগুলো মনে আছে। বিশ্বের তাবত প্রতিবাদী যুবশক্তির চেহারা একরকম।

একদিন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ছোট্ট উঠানে কয়েকজনের একটা জটলা দেখতে পেলাম। গেইট দিয়ে ঢোকার সময় সকলের মুখেই থমথমে ভাব দেখে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। কামরুল ভাই (কামরুল হাসান) হাত ইশারায় ডাকলেন। কাছে যেতেই দেখি সকলের চোখ লাল। যেন জোর করে কান্না চেপে রেখেছে সবাই। কেউ- একজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল আলতাফ ভাই (আলতাফ মাহমুদ) আর নেই। পাকিস্তানি পশুরা আর রাজাকারেরা মিলে তাঁকে নৃশংস অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে। মুহূর্তেই মানসপটে ভেসে উঠল দৃঢ় চেহারার আলতাফ ভাইয়ের মুখ। করাচিতে আমাদের বাসায় এসেছিলেন সালাহউদ্দিন কাকুর খোঁজ করতে। সালাহউদ্দিন কাকু হলেন অমর ছবি 'সূর্যস্নান' ও 'রূপবানে'র পরিচালক।

তিনি ছিলেন আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। করাচিতে এসে আমাদের বাসায় উঠেছিলেন। ছিলেন কিছুদিন। কেন জানি সেই ঘটনাটাই বারবার মনে পড়তে লাগল। আমি চোখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। মনে পড়ে গেল ঝিনু আপার কথা। কোলে শিশু সন্তান শাওন। আমাকে এমন করে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে কামরুল ভাই বললেন, "না, কাঁদবি না; এখন কান্নার সময় নয়। এখন লড়াই করার সময়।" বলেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

প্রতিটি শিল্পী, কলাকুশলী, নাট্যকার, গীতিকার সংবাদপাঠকের মনে একটাই আকাঙ্ক্ষা একটাই প্রার্থনা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-মুক্তি। সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক মুক্তি। বাংলাভাষার মুক্তি।

প্রখ্যাত গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গান লিখেছেন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের জন্য। সুর করবেন স্বনামখ্যাত সুরকার নীতা সেন। গৌরীদা সমরদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা যারা সমরদার গানের স্কোয়াডে আছি তাদের মধ্যে

অনেকেই যাচ্ছি নীতা সেনের বাসায় গানটা তুলে নিতে। রথীনদা, কল্যাণীদি, লতা ভাই (কাদেরি কিবরিয়া) ঝর্না ব্যানার্জী, আমি, আমার অভিভাবক হিসেবে আমার দাদা তরুণকুমার মহলানবীশ এবং আরো বেশ কয়েকজন আর সমরদা তো আছেনই। গৌরীদা বললেন আজকের লাঞ্চ আমি খাওয়াব। চায়নিজ খাব, কেমন? আমরা সবাই এক্কেবারে লাফিয়ে উঠলাম খুশিতে। প্রায় দশ-বারো জন মানুষ! ঢুকলাম একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে। নীতা সেনের বাসার কাছেই। গৌরীদা তাঁকে নিয়ে এলেন। দুটো টেবিল জোড়া লাগিয়ে আমাদের সকলের বসার ব্যবস্থা হল। গৌরীদা বেয়ারাকে ডেকে প্রথমে থামস্-আপ অর্ডার দিলেন গলা ভিজিয়ে নেয়ার জন্য। তারপর এগফ্রায়েড রাইস আর চিকেন ভেজিটেবল চিলি উইথ গ্রেভির জন্য বললেন। আমাদের মধ্যেই একজন দুজন টয়লেটে গিয়েছিল হাত ধোয়ার জন্য। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বসল। বেশ দ্রুতই খাবার এসে গেল।

এগফ্রায়েড রাইস আর চিকেন ভেজিটেবল চিলি উইথ গ্রেভি। হঠাৎ করে দুই-একজন ফিসফিস করে বলতে লাগল, "আর কিছু নেই? সুপ টুপ বা ফ্রায়েড চিকেন, ম্যান্ডারিন হোল ফিশ! এই দুটো আইটেমই?" আমি লজ্জায় মরে গেলাম। হঠাৎ করে যদি গৌরীদা শুনে ফেলেন! কী অকৃতজ্ঞ আর অভদ্রোচিত কথা! একজন মানুষ যাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো আত্মীয়তা নেই, রক্তের বন্ধন নেই, শুধুমাত্র মানবিকতা এবং ঔদার্যের কারণেই তিনি এতগুলো লোককে দুপুরের খাবার খাওয়াচ্ছেন, তাও চায়নিজ রেস্টুরেন্টে বসে, তাঁর প্রতি কোনো সম্মান-শ্রদ্ধাবোধ দূরে থাক, খাবার আইটেমের স্বল্পতার কারণে তাঁর সমালোচনা করা হচ্ছে। আমার ইচ্ছে হল তাদের গলাধাক্কা দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে দিতে। কিন্তু পাছে গৌরীদা শুনে দুঃখ পান এই ভেবে সেই মুহূর্তে সব হজম করে গেলাম। কিন্তু পরে তাদের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করেছি এই প্রসঙ্গ নিয়ে। অবশ্য ওরাও নিজেদের ভুলটা বুঝতে পেরেছিল। খাওয়াদাওয়া সেরে গেলাম নীতা সেনের বাসায়। মাঝারি আকারের একটা ড্রইংরুমে ফরাশ পেতে বাসার জায়গা করা হয়েছে। হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন নীতা সেন। গৌরীদা তাঁর ঢোলা শার্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে নীতা সেনের হাতে দিলেন। বেশ খানিকক্ষণ ধরে গানটা তিনি দেখলেন। বোধ হয় মনে-মনে ছন্দটা দেখে নিচ্ছিলেন। তারপর হাত নেমে এল হারমোনিয়ামের রিডের ওপর। খুব মিহিগলায় মিষ্টি একটা সুরে তিনি গাইতে লাগলেন-

'ফুলের দেশ, পাখির দেশ গানের দেশ
বাংলাদেশ ....'

আমরা তুলে নিলাম গানটা। পরের দিন সকালে গানের রেকর্ডিং। সমরদার সংগীত পরিচালনায় গানের চেহারাটা কী ভীষণ রকম পালটে গেল। মিষ্টি নরম সুরের গানটা, কথার সাথে ছিল যা অসম্ভব রকমের সামঞ্জস্যপূর্ণ তা হঠাৎ করে প্রচণ্ড একটা ধুম- ধাড়াক্কা মার্কা গানে পরিণত হল। নীতা সেনের নরম সুরের দেশাত্মবোধক গানটা সমরসংগীত হয়ে গেল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে 'জল্লাদের দরবার' ধারাবাহিক নাটক করতে গিয়ে পরিচয় হলো প্রসেনজিৎ বসুর সঙ্গে। বাবুয়া বোস নামেই বেশি পরিচিত। মেহেরপুরের জমিদার। ভাবসাব, চলাফেরা কথাবার্তা সবই জমিদার-সুলভ। জুলফিকার আলি ভুট্টোর চরিত্রে অভিনয় করতেন। আমরা ডাকতাম বাবুয়াদা বলে। কখন যে সত্যি সত্যিই আমার দাদা হয়ে গেলেন বুঝতে পারিনি। যে-কোনো ধরনের বিপদে-আপদে তিনি আমায় রক্ষাকবচের মতো ঘিরে থাকতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে প্রতি পদে-পদেই বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। ষোলো-সতেরো বছর বয়সী তরুণীদের জন্য বিপদের অন্ধকার গর্তগুলো যেন সব সময় হা করেই থাকে। একটু অসতর্ক হলেই আর রক্ষে নেই। সেই সময় যেমন দেখেছি মানুষের মহামানবের মতো চেহারা, তেমনি দেখেছি পশুর মতো, দানবের মতো চেহারা। 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা' থেকে বরেণ্য একজন চিত্রপরিচালকের দুর্বৃত্তসুলভ আচরণের জন্য চলে এসেছিলাম কাউকে কিছু না বলে। অনেক দিন পর স্বাধীন বাংলাদেশে ওয়াহিদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে ফুল দিতে গিয়ে। ওয়াহিদ ভাই খুব আহত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এমন না বলে চলে এসেছিলি কেন রে? কোথায় হারিয়ে গেলি তুই? না কোনো ঠিকানা, না কোনো খবর! পরে অবশ্য জেনেছিলাম তুই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিস। গান করছিস, নাটক করছিস।" ওয়াহিদ ভাইয়ের কথা শুনে সেদিন খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, না জানিয়ে এইভাবে চলে আসাটা আমার উচিত হয়নি। খুব কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিলাম "কেন চলে এসেছিলাম পরে আপনাকে একসময় বলব।" কখনো বলা হয়নি।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে যখন অনুষ্ঠান করা শুরু করলাম, তখনো কিছু-কিছু নরপশুর লোলুপ দৃষ্টি কিছুতেই পিছু ছাড়ত না। বাবার বয়সী মানুষেরাও যে

এমন আচরণ করতে পারে বিশ্বাসই হতো না। অত্যন্ত বিখ্যাত একজন সংগীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম তাঁর অশ্লীল আচরণের জন্য। অবশ্য উচিত শিক্ষাও পেয়েছিল সে আমার কাছ থেকে। কিন্তু তখন এমন কিছু মানুষেরও সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম যারা সত্যিই বড় ভাইয়ের মতো, পিতার মতো, বন্ধুর মতো আমাকে ঘিরে থাকতেন। বাবুয়াদা, লোহানী ভাই, কামরুল ভাই, আরবাব ভাই, মণি ভাই, অজিতদা, মাধুরী মাসিমা, শ্যামদা, রথীনদা ওঁরা প্রচণ্ড ভালোবাসতেন আমাকে। আমি বুঝতাম এঁরা আমাকে ছায়ার মতো ঘিরে আছেন। সাহস পেতাম, মনোবল বেড়ে যেত, সব রকমের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার কিংবা আত্মরক্ষার শক্তি পেতাম ভীষণভাবে।

একদা ভারতে কংগ্রেস দলীয় সাংসদ, পরবর্তীতে তৃণমূল থেকে নির্বাচিত সাংসদ এবং কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখার্জি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা। সুদর্শন সুব্রত মুখার্জি ১৯৭১ সালে সম্ভবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের ভি.পি.। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা চারজন আমন্ত্রিত শিল্পী। অনুপ ভট্টাচার্য, রফিকুল আলম, মিতালী মুখার্জি এবং আমি। মিতালীর বড় বোন শ্যামলীদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সুব্রত মুখার্জির সতীর্থ। আমাদেরকে বসতে দেয়া হয়েছে একটি ঘরে। চা-বিস্কুট, কচুরি দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। অনেক ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কৌতূহলী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, কেউ-কেউ নিজস্ব মতামতও দিচ্ছে। বেশ হৈ-হট্টগোল। সুব্রত মুখার্জি সদাব্যস্ত। মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না সে-বিষয়ে। একসময় এসে বসলেন সেই ঘরে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে স্বাভাবিক ভাবেই একসময় উঠে এল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, শেখ মুজিবর রহমান, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, মণি সিং, অধ্যাপক মোজাফ্ফর, আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন, পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন এমনি হাজারো বিষয়। হঠাৎ একসময় সুব্রত মুখার্জি মুখে একটু ব্যাঙাচি-মার্কা হাসি টেনে বললেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব শরণার্থী ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেব।" এতটাই অপ্রাসঙ্গিক ছিল কথাটা যে আমরা হঠাৎ চমকে উঠে কিছুক্ষণ থ মেরে রইলাম। উনি উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই

আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাঁর ওপর– "দাঁড়ান, দাঁড়ান, কী বললেন? আপনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা? এইরকম ভাষায় কথা বলেন আপনি? আমাদের কোনো ছাত্রনেতা এই ভাষায় কথা বললে শুধু ঝেঁটিয়ে বিদায় করা নয়, পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিত সাধারণ ছাত্ররা।" আমার ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি দেখে অন্যেরা কেউ কথা বলল না কিন্তু শ্যামলীদি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সুব্রত মুখার্জির ওপর। সুব্রত মুখার্জি বললেন, "আরে আমি তো নেহাতই ঠাট্টাচ্ছলে বলেছি কথাটা। তোমরা এতটা সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন বিষয়টাকে? শ্যামলীদি বললেন, "এমন অভদ্র কথা ঠাট্টা করেও বলা যায় নাকি?" গাধা গোরু কথা বলতে পারলে ওরাও তো বলত না।" সব রকম গালিগালাজ হজম করে রীতিমত ক্ষমা চেয়ে সুব্রত পালিয়ে বাঁচলেন। ছাত্র সংসদের অন্য সদস্যরাও বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল এই অভদ্রোচিত উক্তির জন্য।

আমরা কাঁচরাপাড়া ছেড়ে চলে এসেছি খিদিরপুরের পদ্মপুকুর লেনে। পদ্মপুকুরের খানিক দূরেই ইকবালপুর ও মোমিনপুর। মুসলিমপ্রধান এলাকা। জেঠিমা অসাধারণ সুন্দরী বিদুষী ও গুণী মহিলা। অপূর্ব কীর্তন গাইতে পারেন। তাঁদের ছেলে-মেয়ে আমার খুকুদি ও তুকান দাদা। খুকুদি ভালো রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী এবং তুকান দাদা সেতার বাজায়। একদিন তাদের বাসায় যাওয়ার পথে দেখলাম বেশ কয়েকটা বাসায় পাকিস্তানের পতাকা। এটা কি গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে, না রাষ্ট্রদ্রোহিতা! জেঠুমণির বাসায় গিয়ে কথাটা বললাম। তুকান দাদা বলল, "শুধু কি পতাকা ওড়ানো? ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে রীতিমতো মিছিল করে স্লোগান দিচ্ছে এখনও এরা। মনের ভেতর ভীষণ ক্রোধ জমা হতে থাকল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এরা সংখ্যায় কেমন? এই পাড়ার সব মুসলমান পরিবারই কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে?" "আরে না-না, এরা সংখ্যায় খুব বেশি না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই বেশি লোক। মাঝেমধ্যে দুই দলে তর্কাতর্কি থেকে শুরু করে হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায়। ইকবালপুরে অবশ্য পাকিস্তানিদের পক্ষের লোক এখান থেকে বেশি।" তুকান দাদার উত্তর। আমি ক্রমশ আরো উত্তপ্ত হতে থাকি। বললাম, "তোমরা কিছু বলো না?" "তোর কি মাথা খারাপ? এসব নিয়ে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে যাব?" বুঝলাম, আমাদের সেন্টিমেন্টটা ওরা বুঝবে না। চুপ করে গেলাম।

খুকুদি বলল, "চল চেতলা থেকে ঘুরে আসি।" চেতলার জেঠুমণি-জেঠিমাও খুব ভালো মানুষ। জেঠুমণি খেতে এবং খাওয়াতে খুব ভালোবাসেন। মাসের

প্রথম সপ্তাহে খাবারের পেছনে এতটাই খরচ করে ফেলেন যে বাকি তিন সপ্তাহ কাঁচা লঙ্কা আর নুন দিয়ে খেতে হয়। এটা অবশ্য জেঠিমার সহাস্য অনুযোগ। আমরা যাওয়ার সাথে সাথেই "একটু আসছি, তোরা বোস" বলে বেরিয়ে গেলেন। আমাদের বুঝতে বাকি রইল না ঘটনাটা কী ঘটতে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখি দই, মিষ্টি, শিঙাড়া, চানাচুর, ক্যাটবেরির চকলেট নিয়ে ঢুকলেন। চকলেটগুলো নিজের হাতে রেখে বাকি জিনিসগুলো জেঠিমার হাতে তুলে দিলেন। প্রথমেই একটা চকলেট বার আমার হাতে দিয়ে বললেন, "দ্যাখ তো, এটার টেস্ট কেমন? গতবারেরটা ভালো, না এটা!" আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। আমি যে চকলেট খেতে ভীষণ ভালোবাসি সেটা জেঠুমণি এর আগের বার যখন এসেছিলাম তখনই জেনেছেন আর মনেও রেখেছেন কী চকলেট এনেছিলেন। এবার তাই অন্য স্বাদের চকলেট নিয়ে এসেছেন আমার জন্য। মানুষের স্বভাব কী অদ্ভুত! ঘরে কোনো চাকচিক্য নেই, নেহাতই সাধারণ আসবাবপত্র, যা একান্তই না হলে চলে না। সবকিছুই সাদামাটা। কিন্তু খাবারের বিষয়ে ঠিক তার উলটো। সবকিছুই খুব ভালো এবং উন্নত মানের হতে হবে এবং পরিমাণেও বেশি। মন-প্রাণ ভরে খেয়ে যেন একটু বাড়তি থেকে যায়। তা না হলে জেঠুমণির মনে হয়, হয়তো আরো একটু বেশি থাকলে সেটাও খাওয়া হতো। যেন একটু কম পড়ে গেল! জেঠুমণিকে নিয়ে খাবার-বিষয়ক অনেক গল্প চালু আছে আমাদের পরিবারে।

আমার জ্যাঠতুতো বোন রমা বলল, "দিদি, নির্মলা মিশ্রের বাড়িতে যাবে? গতবার তো তোমার তাড়াহুড়োর জন্য যাওয়া হলো না।" বললাম, "চল"। খুকুদি আর তুকান দাদা এল না। প্রায় মুখোমুখি বাড়ি। তবে ওঁদের বাড়িটা বেশ বড়। রমা নির্মলা মিশ্রদের বাড়ির বাইরের দরজা ঠেলে আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে হাঁকডাক দিতে শুরু করল। "নির্মলা দি, ও নির্মলা দি, তোমার অতিথি নিয়ে এসেছি।" ভেতর থেকে একটু ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আয়, ভেতরে আয়।" আমার ভেতরে খুশির হিল্লোল। নির্মলা মিশ্র আমার একজন প্রিয় শিল্পী। বিশেষ করে তাঁর 'ও তোতা পাখিরে' গানটা আমাদের দেশেও ভীষণ জনপ্রিয়। আমি খুব গাই গানটা। সবাই বলে, আমার কণ্ঠে এই গানটা নাকি খুব ভালো হয়।

ভেতরে গিয়ে দেখি মাটিতে একটা আসন পেতে এক মহিলা ছোট বাচ্চার গলায় বিব লাগিয়ে সুজি খাওয়াচ্ছেন চামচে নিয়ে নিয়ে। গলায় একটা মোটা

রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে। কোঁকড়ানো উসখোখুসকো চুল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না এই অদ্ভুতদর্শন মহিলাই নির্মলা মিশ্র কি না। রমা ধপ করে মোজাইক করা ঝকঝকে মেঝেতে বসে পড়ে বলল, "নির্মলা দি, এটা আমার দিদি। খুড়তুতো বোন; বাংলাদেশ থেকে এসেছে। খুব ভালো গান গায়।" আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম 'না না, একটু-আধটু গাওয়ার চেষ্টা করি।" আস্তে আস্তে ওকে মৃদু ধমকের সুরে বললাম, "কার সামনে তুই কী বলছিস? উনি কত বড় শিল্পী!"

আমি একটু ভাবনায় পড়ে গেলাম। কোলে এই বাচ্চাটা কে? নির্মলা মিশ্র কি বিবাহিত? কুমারী? বিধবা? নির্মলা মিশ্র হঠাৎ বলে উঠলেন "উহ্! এই দস্যিটাকে নিয়ে আর পারি না। খাওয়া নিয়ে যে কী ঝামেলা করে!"

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার ভাইয়ের ছেলে। আমার কাছেই থাকে। ওর মার কাছেও যায় না।" একটা সমস্যার সমাধান হলো। বাকিটা বুঝলাম না। রমা বলল, "তুমি খুব ভালো গান গাও, একটা গান শোনাও।" আমি খুবই লজ্জা পেয়ে বললাম, "না না, আপনার সামনে গাইতে পারব না।" "আচ্ছা চলো, দুইজন একসঙ্গে গাই। কোন গান গাইব বলো। সন্ধ্যা মুখার্জীর গান, নাকি লতাজির, নাকি প্রতিমাদির গান?" আমি লক্ষ করলাম তিনজনের নাম তিনভাবে বললেন। আর নিজের গানের কথা কিছুই বললেন না। আমি বললাম, "আপনার গাওয়া গানই গাইব। ও তোতা পাখিরে-।" "ওহ্! এটা আমার খুবই প্রিয় গান। ভালো গেয়েছি না? বলো!" ওঁর এই সহজ কথাবার্তায় জড়তা কেটে গেল। দুজন মিলে খালি গলাতেই শুরু করলাম। এক লাইন গেয়েই উনি থেমে গেলেন। আমি গাইতে থাকলাম। গান শেষ হলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "অপূর্ব! তুমি এই গান আমার চেয়েও ভালো গাও। তোমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য আমরা ফান্ড রেইজ করি তো, অনেক অনুষ্ঠানে আমি এই গান গেয়েছি। এই গানটা শুনলে সবাই কাঁদে। এইবার কোনো একটা অনুষ্ঠানে তোমাকে দিয়ে গানটা গাওয়াব। কী ভালো কণ্ঠ তোমার, আর কী ইমোশন! আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এত বড় শিল্পী, অথচ কী সহজ সরল কথাবার্তা, কী উদার অকপট প্রশংসা!

সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায় ট্রেন বাসের চিড়ে-চ্যাপ্টা ভিড়, রিহার্সাল রেকর্ডিং আর অনুষ্ঠান নিয়ে। রাতে বাসায় ফিরে ঘুম আসে না। কী করছে এখন লালাবাবু? কোনো জঙ্গলে তার দল নিয়ে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে? কোনো অপারেশন শেষ করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে? কোনো পাকসেনার দলকে খতম করে আনন্দ উল্লাস করছে? নাকি ... নাহ্! ওসব কথা ভাবতে চাইনা। কিন্তু দুশ্চিন্তা আর ভয় কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। কবে আসবে স্বাধীনতা? আর কত দিন?

তারপর একদিন এল সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিন। সকাল এগারোটা কি সাড়ে এগারোটার দিকে শুনতে পেলাম আজ অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর বেলা চারটায় (ঢাকার সময়) রমনার রেসকোর্সের ময়দানে জেনারেল নিয়াজি ভারতীয় সেনাপ্রধানের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। বেতারকেন্দ্রের সকলের চোখে-মুখে-দেহে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

সংগীতশিল্পীদের ডাক পড়ল বেতারকেন্দ্রের নিচের হলঘরটায় যেখানে তখন রিহার্সাল হতো। কণ্ঠশিল্পী এবং যন্ত্রী মিলিয়ে আমরা প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন জড়ো হয়েছি সেখানে। শহীদুল ইসলাম একটা গানের স্থায়ী আর প্রথম অন্তরা লিখেছেন। দিয়েছেন শ্যামদাকে সুর করতে। শ্যামদা সুর করে অজিতদাকে শুনিয়েছেন। তখনো দ্বিতীয় অন্তরা লেখা হয়নি। অজিতদা আর শ্যামদা আমাদের সবাইকে নিয়ে বসলেন। অজিতদা গাইলেন:

বিজয় নিশান উড়ছে ওই...

আমরা ধরলাম: উড়ছে ওই, উড়ছে ওই, উড়ছে ওই...

এইভাবে অজিতদা লিড ভয়েস দিচ্ছেন আর আমরা সবাই সমবেত কণ্ঠে তাঁর সঙ্গে ধুয়া ধরছি। স্থায়ী এবং প্রথম অন্তরা শেখা হয়ে গেল। এর মধ্যে

শহীদ ভাই দ্বিতীয় অন্তরাও লিখে ফেলেছেন। যথারীতি সঙ্গে সঙ্গে সুরও হয়ে গেল। অবশ্য সেটা প্রথম অন্তরার মতোই। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই শিখেও নিলাম।

আমরা রিহার্সাল করছি। আমি বাইরের জানালার দিকে মুখ ফিরে বসে। হঠাৎ দেখি লালাবাবু, আমার স্বামী, বাইরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমি রিহার্সাল ভুলে ঝট করে উঠে দাঁড়াতেই অজিতদা দিলেন এক ধমক। আমার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে লাগল। কল্যাণীদি আর রথীনদাও লালাবাবুকে দেখেছেন। ওরা চেনেন লালাবাবুকে। লালাবাবু যে মুক্তিযুদ্ধে ৫ নং সেক্টরের সাবসেক্টর কমান্ডার সেকথা অনেকেই জানে। ওরা লালাবাবুর কথা জানাতেই অজিতদা খুব আদর করে বললেন, "ও, এই কথা! আচ্ছা যা–কিন্তু একবার দেখা করেই চলে আসিস। একটু পরেই গান রেকর্ড করব।" আমি পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে লাগলাম।

বাইরে এসে দেখি লালাবাবু নেই। এদিক খুঁজি, ওদিক খুঁজি, কোথাও নেই। নেই তো নেইই। আমার ছোট বোন শুক্তিও এসেছিল আমার পেছন পেছন। সেও এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করে নিরাশ হয়ে ফিরে এল। বুকের ভেতরটা হুহু করে উঠল। আমি কি তবে ভুল দেখলাম? ও কি এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে! সিঁড়ির ওপর মুখ ঢেকে বসে পড়লাম। আমার দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও রইল না। ওদিকে ভেতর থেকে গানের শব্দ ভেসে আসছে : অন্ধকারের আঁধার থেকে– ছিনিয়ে আনব বঙ্গবন্ধুকে...

হঠাৎ মাথায় হাতের স্পর্শ পেয়েই লাফিয়ে উঠলাম। গলার ভেতর যেন হিমালয় পর্বত আটকে আছে। কোনো কথা বের হচ্ছে না। শুক্তি আমার অবস্থা দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ছিলেন জামাইবাবু? রিহার্সাল থেকে বেরিয়ে এসে আপনাকে কত খোঁজাখুঁজি করলাম! মিনিটের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন?" মাত্র ১২ বছরের মেয়ের ভেতরের প্রচণ্ড উদ্বেগ প্রশ্ন হয়ে বেরিয়ে এল। লালাবাবুও ওর প্রশ্নের ধরনে মনে-মনে একটু যেন অপরাধবোধে আক্রান্ত হল। শুক্তির মাথায় হাত রেখে আদর করে বলল 'সরি, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। তোমরা রিহার্সাল করছ দেখে রাস্তায় উলটোদিকের দোকান থেকে সিগারেট কিনতে গিয়েছিলাম।

রিহার্সালে একটু বাধা পড়ায় অজিতদাও তাড়াতাড়ি লাঞ্চ ব্রেক দিয়ে দিয়েছিলেন। গানটা সবার তোলাও হয়ে গেছে। লাঞ্চের পরেই রেকর্ডিং হবে।

সেদিন প্রায় সবাই মিলেই গেলাম পাঞ্জাবি খাবার দোকানে। পুরি-ভাজি, মাংস, আচার-রাইতা দিয়ে খুব মজা করে খেলাম। সবার ভেতরই প্রচণ্ড উত্তেজনা। চারটা কখন বাজবে! আমাদের গানও রেকর্ড করতে হবে তার আগে। বিজয়-ঘোষণার প্রথম মুহূর্তেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাজানো হবে সেই গান।

বিজয় নিশান উড়ছে ওই
খুশির হাওয়ায় ওই উড়ছে
বাংলার ঘরে ঘরে
মুক্তির আলো ওই ঝরছে।

বাংলাদেশের বিজয়ের ইতিহাসে এই একটি গানের মাধ্যমেই ইতিহাস হয়ে রইলেন শহীদুল ইসলাম, সুজেয় শ্যাম এবং অজিত রায়। তার অংশীদার হলাম আমরাও।

মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু ছবি ও দলিল

Government of India
All India Radio : Calcutta.

Post Box No.690,
Eden Gardens,

No.Cal-28(20)/71-PII. Calcutta-1, the 21 JUL 1971.

Shri [illegible],
PA/3/13, New Colony,
Kanchrapara (24 Parganas)

Dear Sir/Madam,

We have much pleasure in inviting you for recording in our studios on 29.7.71 and the necessary contract in this regard is enclosed. The reply sheet may kindly be signed and sent to us by return of post. The recordings will be broadcast in our Special Service for listeners in the Eastern Region. We have to mention in this connection that this arrangement for your recording has been purely on a temporary basis in view of your present stay in this country. If and when, you decide to settle down in this country, the scope and possibility for your enlistment as a permanent artist of this Station will be examined in accordance with the prescribed rules.

Thanking you,

Yours faithfully,

[illegible] 21.7.71
For Station Director.

Encl. : As above.

আকাশবাণী কোলকাতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণপত্র।

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করছেন (সর্ববামে লেখক)

LEAVE CERTIFICATE.

Lt.S.K.Lala, who has already resigned from the services, granted 15 (fifteen) days leave pending decision of his resignation.

His Home Address:

Vill- Poopadia

PO. Kharandwip

PS. Bowalkhali

Dist. Chittagong

MAJOR
SUB SECTOR COMD
(MA MUTTALIB)
SUNAMGANJ.

লে: সরিতকুমার লালা যুদ্ধ শেষে পদত্যাগের আবেদন স্থগিত সংক্রান্ত দলিল।

৫ নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমাণ্ডার সরিতকুমার লালা (বসা ডানপাশে) ও সহযোদ্ধাগণ।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
SWADHIN BANGLA BETAR KENDRA
MUJIBNAGAR

Memo No. SBBK/71/Cont—D / Dated...29...10...71.

To
~~Mr/Mrs/Miss~~ ~~Bulbul Mahaoobich~~

Dear Sir,

We are glad to offer you a contract of programme for broadcast from Swadhin Bangla Betar Kendra as per description put below :

Particulars of the programme	:	To participate in drama ~~XXXX~~ feature Banglar Mukh.
Date of Recording	:	To be recorded on 1.11.71 ~~2? 10 71~~
Date of Broadcast	:	As required
Time of Broadcast	:	As required.
Duration	:	15 mts.
Fee	:	Rs. 20/-

If the offer suits your convenience, we shall be grateful if you kindly send back to us the attached acceptance sheet duly signed by you within two days from the date of receipt of the contract. The ~~broadcasting rules~~ of Swadhin Bangla Betar Kendra are printed overleaf for your kind guidance.

Thanking you,

Yours faithfully,

For the Authority,
Swadhin Bangla Betar Kendra
For and on behalf of the President Govt of
the People's Republic of Bangladesh

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে 'বাংলার মুখ' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের চুক্তিপত্র

Temporary Artist for programmes in Special Service for
EASTERN REGION.

Telegrams :
AKASHVANI

INDIAN MUSIC

A. I. R-2(a).

ALL INDIA RADIO

Calcutta STATION MT/

21 JUL 1971 19

Dear ~~Sir~~, Madam,

We offer you an engagement to broadcast and to perform as follows :—

DATE of recording 29th July, (at 4.30 p.m.) *TIME* As required.

PLACE AIR : CALCUTTA.

APPROXIMATE DURATION OF PERFORMANCE 30 mts. (15' + 15').

PROGRAMME Nazrulgeeti

FEE FOR BROADCAST Rs.120/- (Rupees One hundred & twenty only

FEE PER BROADCAST OF A MECHANICAL REPRODUCTION OF THE PERFORMANCE nil

The above offer is contingent on your compliance with the following terms, and with the conditions printed overleaf :—

1. That your signed acceptance, together with all necessary particulars, is in our hands by

~~2. That you shall attend rehearsals if and when required.~~

3. That you shall complete, return and submit for approval the programme form which is attached hereto (together with a printed copy or typescript of all songs, words and materials you proposed to use) to the Station Director, All India Radio

~~Cess any will be borne by the Giver.~~

Yours faithfully,

Station Director,
For and on behalf of the President of India.

Name Smt. Bulbul Lala,
Address C/o. Shri Bishnu Chatterjee,
PA/5/B, New Colony,
Kanchrapara, 24-Parganas.

আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রের 'পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য' অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনের চুক্তিপত্র

PROVISIONAL RELEASE CERTIFICATE

Certified that No.BSS-4076 Rank 2/Lt Name- SARIT KUMAR LALA S/O Subimal Chandra Lala Village- [illegible] PC- Kharandwip PS- Boalkhali Dist- Chittagong has served the Bangladesh 'MUKTI BAHINI' during liberation war. He has contributed a lot towards the final success.

He has been released from the 'MUKTI BAHINI' wef [illegible] 72

[illegible] his previous service/[illegible]

He has been paid a subsistence allowance upto Dec'71.

A permanent release certificate will be issued later.

Hq Sylhet Area BDF
Subid Bazar, Sylhet
No. 6008/R/
07 Apr 72

Col
Comd
Sylhet Sector BDF

লে: সরিতকুমার লালা যুদ্ধ শেষে সেক্টর থেকে অব্যাহতির দলিল।

Received Rs. 29,610/- (Rupees Twenty nine thousand six hundred and ten) only from Lt. S. K. Lala, a collection from different markets and other sources of revenue, during the liberation period but not later than 25th Nov.'71.

Dt. 21.11.71.

MAJ.
(M.A. MUTTALIB)

সেইসব প্রিয়মুখ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যাঁদের অবদান অসামান্য

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণবেশ সেন

উপেন তরফদার

গোবিন্দ হালদার

বিমলভূষণ

শহীদ আলতাফ মাহমুদ ও বুলবুল মহলানবীশ, করাচী, ১৯৬৩।